প্রজাপতির নির্বন্ধ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সূচিপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ 3

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 16

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 20

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 35

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 47

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 59

সপ্তম পরিচ্ছেদ 73

অষ্টম পরিচ্ছেদ 84

নবম পরিচ্ছেদ 101

দশম পরিচ্ছেদ 120

একাদশ পরিচ্ছেদ 138

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 162

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 167

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 176
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 183
ষোড়শ পরিচ্ছেদ 195

প্রথম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়কুমারের শ্বশুর হিন্দুসমাজে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চালচলন অত্যন্ত নব্য ছিল। মেয়েদের তিনি দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইতেছিলেন। লোকে আপত্তি করিলে বলিতেন, আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে তো চিরকালই এইরূপ প্রথা।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা জগত্তারিণীর ইচ্ছা, লেখাপড়া বন্ধ করিয়া মেয়েগুলির বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তিনি ঢিলা প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ইচ্ছা যাহা হয় তাহার উপায় অন্বেষণ করিয়া উঠিতে পারেন না। সময় যতই অতীত হইতে থাকে আর পাঁচজনের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন।

জামাতা অক্ষয়কুমার পুরা নব্য। শ্যালীগুলিকে তিনি পাস করাইয়া নব্যসমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারিয়েটে তিনি বড়োরকমের কাজ করেন, গরমের সময় তাঁহাকে সিমলা পাহাড়ে আপিস করিতে হয়। অনেক রাজঘরের দূত, বড়ো সাহেবের সহিত বোঝাপড়া করাইয়া দিবার জন্য বিপদে-আপদে তাঁহার হাতে-পায়ে আসিয়া ধরে। এই-সকল নানা কারণে শ্বশুরবাড়িতে তাঁহার পসার বেশি। বিধবা শাশুড়ি তাঁহাকেই অনাথা পরিবারের অভিভাবক বলিয়া জ্ঞান করেন। শীতের কয় মাস শাশুড়ির পীড়াপীড়িতে তিনি কলিকাতায় তাঁহার ধনী শ্বশুরগৃহেই যাপন করেন। সেই কয় মাস তাঁহার শ্যালী-সমিতিতে উৎসব পড়িয়া যায়।

সেইরূপ কলিকাতা-বাসের সময় একদা শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রী পুরবালার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের নিম্নলিখিত মতো কথাবার্তা হয়–

পুরবালা। তোমার নিজের বোন হলে দেখতুম কেমন চুপ করে বসে থাকতে! এতদিনে এক-একটির তিনটি-চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আনতে! ওরা আমার বোন কিনা–

অক্ষয়। মানব-চরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ। তা ভাই, শ্বশুরের কোনো কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ করতে কিছুতেই মন সরে না– এ বিষয়ে আমার ঔদার্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।

পুরবালা সামান্য একটু রাগের মতো ভাব করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল, "দেখো, তোমার সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে।"

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো মন্ত্র পড়ে বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে, আবার আর-একটা!

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক নয়। এটা হয়তো তেমন অসহ্য না হতেও পারে।

অক্ষয় যাত্রার অধিকারীর মতো হাত নাড়িয়া বলিল, "সখী, তবে খুলে বলো!"

বলিয়া ঝিঁঝিটে গান ধরিল–

কী জানি কী ভেবেছ মনে,
খুলে বলো ললনে!
কী কথা হায় ভেসে যায়
ওই ছলছল নয়নে!

এইখানে বলা আবশ্যক, অক্ষয়কুমার ঝোঁকের মাথায় দুটো-চারটে লাইন গান মুখে মুখে বানাইয়া গাহিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কখনোই কোনো গান রীতিমত সম্পূর্ণ করিতেন না। বন্ধুরা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "তোমার এমন অসামান্য ক্ষমতা, কিন্তু গানগুলো শেষ কর না কেন?" অক্ষয় ফস করিয়া তান ধরিয়া তাহার জবাব দিতেন–

সখা শেষ করা কি ভালো?

তেল ফুরোবার আগেই আমি নিবিয়ে দেব আলো!

এইরূপ ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলে, অক্ষয়কে কিছুতেই পারিয়া উঠা যায় না।

পুরবালাও ত্যক্ত হইয়া বলিলেন, "ওস্তাদজি, থামো! আমার প্রস্তাব এই যে দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক করো যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাকবে– যখন তোমার সঙ্গে দুটো-একটা কাজের কথা হতে পারবে!"

অক্ষয়। গরিবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা বলতে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ্ করে বাজুবন্দ চেয়ে বসে।

আবার গান–

পাছে চেয়ে বসে আমার মন

আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি,

পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা

আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।

পুরবালা। তবে যাও!

অক্ষয়। না না, রাগারাগি না! আচ্ছা, যা বল তাই শুনব! খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারণী সভার সভ্য হব! তোমার সামনে কোনোরকমের বেয়াদবি করব না! তা, কী কথা হচ্ছিল! শ্যালীদের বিবাহ! উত্তম প্রস্তাব!

পুরবালা গম্ভীর বিষণ্ন হইয়া কহিল, "দেখো, এখন বাবা নেই। মা তোমারই মুখ চেয়ে আছেন। তোমারই কথা শুনে এখনো তিনি বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়েদের লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে দিতে পার তা হলে কী অন্যায় হবে ভেবে দেখো দেখি!"

অক্ষয় দুর্লক্ষণ দেখিয়া পূর্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন, “আমি তো তোমাকে বলেইছি তোমরা কোনো ভাবনা কোরো না। আমার শ্যালীপতিরা গোকুলে বাড়ছেন।”

পুরবালা। গোকুলটি কোথায়?

অক্ষয়। যেখান থেকে এই হতভাগ্যকে তোমার গোষ্ঠে ভরতি করেছ। আমাদের সেই চিরকুমার-সভা।

পুরবালা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল, “প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই!”

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন? তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র। সেইজন্যে ভগবান প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ঐ সভাটার উপরেই। সরাচাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে– প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্যগুলিও একেবারে হাড়ের কাছ পর্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন– দিব্যি বিবাহযোগ্য হয়ে এসেছেন– এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও তো এক কালে ঐ সভার সভাপতি ছিলুম!

আনন্দিতা পুরবালা বিজয়গর্বে ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কিরকম দশাটা হয়েছিল!”

অক্ষয়। সে আর কী বলব! প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পর্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে,মনে হত শ্রীকৃষ্ণের ষোলোশো গোপিনী যদি-বা সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হন অন্তত মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই– ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আর কি!

পুরবালা। চৌষট্টি হাজারের শখ মিটল?

অক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সামনে বলব না! জাঁক হবে। তবে ইশারায় বলতে পারি মা কালী দয়া করেছেন বটে! এই বলিয়া পুরবালার চিবুক ধরিয়া মুখটি একটুখানি তুলিয়া সকৌতুকে স্নিগ্ধ প্রেমে একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। পুরবালা কৃত্রিম

কলহে মুখ সরাইয়া লইয়া কহিলেন, "তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দীভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করেছিলেন!"

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যেই কার্তিকটি পেয়েছ!

পুরবালা। আবার ঠাট্টা শুরু হল?

অক্ষয়। কার্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা? গা ছুঁয়ে বলছি ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস!

এমন সময় শৈলবালার প্রবেশ। ইনি মেজো বোন। বিবাহের এক মাসের মধ্যে বিধবা। চুলগুলি ছোটো করিয়া ছাঁটা বলিয়া ছেলের মতো দেখিতে। সংস্কৃত ভাষায় অনার দিয়া বি| এ| পাস করিবার জন্য উৎসুক।

শৈল আসিয়া বলিল, "মুখুজ্যেমশায়, এইবার তোমার ছোটো দুটি শ্যালীকে রক্ষা করো।"

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন তো আমি আছি। ব্যাপারটা কী?

শৈল। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিকদাদা কোথা থেকে একজোড়া কুলীনের ছেলে এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয়। ওরে বাস্‌রে! একেবারে বিয়ের এপিডেমিক! প্লেগের মতো! এক বাড়িতে একসঙ্গে দুই কন্যাকে আক্রমণ! ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে। বলিয়া কালাংড়ায় গান ধরিয়া দিলেন–

বড়ো থাকি কাছাকাছি

তাই ভয়ে ভয়ে আছি।

নয়ন বচন কোথায় কখন বাজিলে বাঁচি না বাঁচি।

শৈল। এই কি তোমার গান গাবার সময় হল?

অক্ষয়। কী করব ভাই! রোশনচৌকি বাজাতে শিখি নি, তা হলে ধরতুম। বল কী, শুভকর্ম! দুই শ্যালীর উদ্‌বাহবন্ধন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন?

শৈল। বৈশাখ মাসের পর আসছে বছরে আকাল পড়বে, আর বিয়ের দিন নেই।

পুরবালা নিজের স্বামীটি লইয়া সুখী, এবং তাহার বিশ্বাস যেমন করিয়া হোক স্ত্রীলোকের একটা বিবাহ হইয়া গেলেই সুখের দশা। সে মনে মনে খুশি হইয়া বলিল, "তোরা আগে থাকতে ভাবিস কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা যাক তো।"

ঢিলা লোকেদের স্বভাব এই যে, হঠাৎ একদা অসময়ে তাহারা মন স্থির করে, তখন ভালোমন্দ বিচার করিবার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া একদমে পূর্বকার সুদীর্ঘ শৈথিল্য সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। তখন কিছুতেই তাহাদের আর এক মুহূর্ত সবুর সয় না। কর্ত্রী ঠাকুরানীর সেইরূপ অবস্থা। তিনি আসিয়া বলিলেন, "বাবা অক্ষয়!"

অক্ষয়। কী মা!

জগৎ। তোমার কথা শুনে আর তো মেয়েদের রাখতে পারি নে!

ইহার মধ্যে এইটুকু আভাস ছিল যে, তাঁহার মেয়েদের সকল প্রকার দুর্ঘটনার জন্য অক্ষয়ই দায়ী।

শৈল কহিল, "মেয়েদের রাখতে পার না বলেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা!"

জগৎ। ঐ তো! তোদের কথা শুনলে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয়, শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে পাস করিয়ে কী হবে বলো দেখি। ওর এত বিদ্যের দরকার কী?

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়েমানুষের একটা-না-একটা কিছু উৎপাত থাকা চাই– হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিস্টিরিয়া। দেখো না, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি, তিনি স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন– আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাকতে হয়!

জগৎ। তা যা বল বাবা, আসছে, বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই!

পুরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়েমানুষের সকাল-সকাল বিয়ে হওয়াই ভালো।

শুনিয়া অক্ষয় তাহাকে জনান্তিকে বলিয়া লইল, "তা তো বটেই! বিশেষত যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ, তখন সকাল-সকাল বিয়ে করে সময়ে পুষিয়ে নেওয়া চাই।"

পুরবালা। আঃ কী বকছ! মা শুনতে পাবেন।

জগৎ। রসিককাকা আজ পাত্র দেখাতে আসবেন, তা চল্ মা পুরি, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখিগে।

আনন্দে উৎসাহে মার সঙ্গে পুরবালা ভাণ্ডার অভিমুখে প্রস্থান করিল।

মুখুজ্যেমশায়ের সঙ্গে শৈলর তখন গোপন কমিটি বসিল। এই শ্যালী-ভাগিনীপতি দুটি পরস্পরের পরম বন্ধু ছিল। অক্ষয়ের মত এবং রুচির দ্বারাই শৈলের স্বভাবটা গঠিত। অক্ষয় তাঁহার এই শিষ্যাটিকে যেন আপনার প্রায় সমবয়স্ক ভাইটির মতো দেখিতেন– স্নেহের সহিত সৌহার্দ্য মিশ্রিত। তাহাকে শ্যালীর মতো ঠাট্টা করিতেন বটে, কিন্তু তাহার প্রতি বন্ধুর মতো একটি সহজ শ্রদ্ধা ছিল।

শৈল কহিল, "আর তো দেরি করা যায় না মুখুজ্যেমশায়। এইবার তোমার সেই চিরকুমার-সভার বিপিনবাবু এবং শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চলছে না। আহা, ছেলে দুটি চমৎকার। আমাদের নেপ আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়। তুমি তো চৈত্রমাস যেতে-না-যেতে আপিস ঘাড়ে করে সিমলে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।"

অক্ষয়। কিন্তু তাই বলে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চমকে যাবে। ডিমের খোলা ভেঙে ফেললেই কিছু পাখি বেরোয় না। যথোচিত তা দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈল একটুখানি চুপ করিয়া রহিল; তার পরে হঠাৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "বেশ তো, তা দেবার ভার আমি নেব মুখুজ্যেমশায়।"

অক্ষয়। আর একটু খোলসা করে বলতে হচ্ছে।

শৈল। ঐ তো দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেকে আমি দেখে নেব।

অক্ষয় নয়ন বিস্ফারিত করিয়া মুহূর্তকাল স্তম্ভিত থাকিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, "আহা, কী আপসোস যে, তোমার দিদিকে বিয়ে করে সভ্য নাম একেবারে জন্মের মতো ঘুচিয়েছি, নইলে দলবলে আমি সুদ্ধ তোমার জালে জড়িয়ে চক্ষু বুজে মরে পড়ে থাকতুম। এমন সুখের ফাঁড়াও কাটে। সখী, তবে মনোযোগ দিয়ে শোনো (সিন্ধুভৈরবীতে গান)–

ওগো হৃদয়-বনের শিকারি!
মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারি;
সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যে জন মরে আছে,
নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী।"

শৈল কহিল, "ছি মুখুজ্যেমশায়, তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্ছ। ঐ-সব নয়ন-বাণ-টানগুলোর এখন কি আর চলন আছে? যুদ্ধবিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে।"

ইতিমধ্যে দুই বোন নৃপবালা, নীরবালা– ষোড়শী এবং চতুর্দশী প্রবেশ করিল। নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীরু তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্বদাই আন্দোলিত।

নীরু আসিয়াই শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মেজদিদি ভাই, আজ কারা আসবে বলো তো?"

নৃপবালা। মুখুজ্যেমশায়, আজ কি তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আছে? জলখাবারের আয়োজন হচ্ছে কেন?

অক্ষয়। ঐ তো! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা করলে– পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কাপাত কী করে ঘটে সে-সমস্ত লাখ দু-লাখ ক্রোশের খবর রাখ, আর আজ ১৮ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে কার আকর্ষণে কে এসে পড়ছে সেটা অনুমান করতেও পারলে না!

নীরবালা। বুঝেছি ভাই সেজদিদি!– বলিয়া নৃপর পিঠে একটা চাপড় মারিল এবং তাহার কানের কাছে মুখ রাখিয়া অল্প একটু গলা নামাইয়া কহিল, "তোর বর আসছে ভাই, তাই সকালবেলা আমার বাঁ চোখ নাচছিল।"

নৃপ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "তোর বাঁ চোখ নাচলে আমার বর আসবে কেন?"

নীরু কহিল, "তা ভাই, আমার বাঁ চোখটা নাহয় তোর বরের জন্যে নেচে নিলে তাতে আমি দুঃখিত নই। কিন্তু মুখুজ্যেমশায়, জলখাবার তো দুটি লোকের জন্যে দেখলুম, সেজদিদি কি স্বয়ম্বরা হবে না কি?"

অক্ষয়। আমাদের ছোড়দিদিও বঞ্চিত হবেন না।

নীরবালা। আহা মুখুজ্যেমশায়, কী সুসংবাদ শোনালে! তোমাকে কী বকশিশ দেব। এই নাও আমার গলার হার, আমার দু-হাতের বালা।

শৈল ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আঃ ছিঃ, হাত খালি করিস নে।"

নীরবালা। আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুজ্যেমশায়।

নৃপবালা। আঃ কী বর-বর করছিস। দেখো তো ভাই মেজদিদি!

অক্ষয়। ওকে ঐজন্যেই তো বর্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্বরে, ভগবান তোমাদের কটি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন তবু তৃপ্তি নেই?

নীরবালা। সেইজন্যেই তো লোভ আরো বেড়ে গেছে।

নৃপ তাহার ছোটো বোনকে সংযত করা অসাধ্য দেখিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। নীরু চলিতে চলিতে দ্বারের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল, "এলে খবর দিয়ো মুখুজ্যেমশায়, ফাঁকি দিয়ো না। দেখছ তো সেজদিদি কিরকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে।"

সহাস্য সস্নেহে দুই বোনকে নিরীক্ষণ করিয়া শৈল কহিল, "মুখুজ্যেমশায়, আমি ঠাট্টা করছি নে– আমি চিরকুমার-সভার সভ্য হব। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত একজন কাউকে চাই তো। তোমার বুঝি আর সভ্য হবার জো নেই?"

অক্ষয়। না, আমি পাপ করেছি। তোমার দিদি আমার তপস্যা ভঙ্গ করে আমাকে স্বর্গ হতে বঞ্চিত করেছেন।

শৈল। তা হলে রসিকদাদাকে ধরতে হচ্ছে। তিনি তো কোনো সভার সভ্য না হয়েও চিরকুমার ব্রত রক্ষা করেছেন।

অক্ষয়। সভ্য হলেই এই বুড়োবয়সে ব্রতটি খোওয়াবেন। ইলিশ মাছ অমনি দিব্যি থাকে, ধরলেই মারা যায়– প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তাকে বাঁধলেই তার সর্বনাশ।

এমন সময়, সম্মুখের মাথায় টাক, পাকা গোঁফ, গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি, রসিকদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয় তাঁহাকে তাড়া করিয়া গেল; কহিল, "ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড, অকালকুষ্মাণ্ড!"

রসিক প্রসারিত দুই হস্তে তাহাকে সম্বরণ করিয়া কহিলেন, "কেন হে, মত্তমন্থর কুঞ্জকুঞ্জর পুঞ্জ-অঞ্জনবর্ণ!"

অক্ষয়। তুমি আমার শ্যালীপুষ্পবনে দাবানল আনতে চাও?

শৈল। রসিকদাদা, তোমারই বা তাতে কী লাভ?

রসিক। ভাই, সইতে পারলুম না, কী করি! বছরে বছরেই তোর বোনদের বয়স বাড়ছে, বড়োমা আমারই দোষ দেন কেন? বলেন, দু-বেলা বসে বসে কেবল খাচ্ছ, মেয়েদের

জন্যে দুটো বর দেখে দিতে পার না! আচ্ছা ভাই, আমি না খেতে রাজি আছি, তা হলেই বর জুটবে– না তোর বোনদের বয়স কমতে থাকবে? এ দিকে যে দুটির বর জুটছে না তাঁরা তো দিব্যি খাচ্ছেন-দাচ্ছেন। শৈল ভাই, কুমারসম্ভব পড়েছিস, মনে আছে তো?–

স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা
পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥

তা ভাই, দুর্গা নিজের বর খুঁজতে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন, কিন্তু নাৎনীদের বর জুটছে না বলে আমি বুড়োমানুষ খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেব, বড়োমার এ কী বিচার! আহা শৈল, ওটা মনে আছে তো?– তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং–

শৈল। মনে আছে দাদা, কিন্তু কালিদাস এখন ভালো লাগছে না।

রসিক। তা হলে তো অত্যন্ত দুঃসময় বলতে হবে।

শৈল। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রসিক। তা, রাজি আছি ভাই। যেরকম পরামর্শ চাও, তাই দেব। যদি "হাঁ' বলাতে চাও "হাঁ' বলব, "না' বলাতে চাও "না' বলব। আমার ঐ গুণটি আছে। আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই বলেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মতোই বুদ্ধিমান ভাবে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেছ, তার মধ্যে তোমার এই টাক একটি।

রসিক। আর একটি হচ্ছে– যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে। তা, আমি বাইরের লোকের কাছে বেশি কথা কই নে–

শৈল। সেইটে বুঝি আমাদের কাছে পুষিয়ে নাও।

রসিক। তোদের কাছে যে ধরা পড়েছি।

শৈল। ধরা যদি পড়ে থাক তো চলো– যা বলি তাই করতে হবে।

বলিয়া পরামর্শের জন্য শৈল তাঁহাকে অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া চলিল।

অক্ষয় বলিতে লাগিল, “অ্যাঁ, শৈল! এই বুঝি! আজ রসিকদা হলেন রাজমন্ত্রী। আমাকে ফাঁকি!”

শৈল যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া হাসিয়া কহিল, “তোমার সঙ্গে আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মুখুজ্যেমশায়? পরামর্শ যে বুড়ো না হলে হয় না।”

অক্ষয় বলিল, “তবে রাজমন্ত্রী-পদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম।” বলিয়া শূন্য ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে খাম্বাজে গান ধরিলেন–

আমি কেবল ফুল জোগাব
তোমার দুটি রাঙা হাতে,
বুদ্ধি আমার খেলে নাকো
পাহারা বা মন্ত্রণাতে।

বাড়ির কর্তা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তিনি রসিককে খুড়া বলিতেন। রসিক দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বাড়ির সুখদুঃখে সম্পূর্ণ জড়িত হইয়া ছিলেন। গিন্নি অগোছালো থাকাতে কর্তার অবর্তমানে তাঁহার কিছু অযত্ন-অসুবিধা হইতেছিল এবং জগত্তারিণীর অসংগত ফরমাশ খাটিয়া তাঁহার অবকাশের অভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই-সমস্ত অভাব-অসুবিধা পূরণ করিবার লোক ছিল শৈল। শৈল থাকাতেই মাঝে মাঝে ব্যামোর সময় তাঁহার পথ্য এবং সেবার ত্রুটি হইতে পারে নাই; এবং তাহারই সহকারিতায় তাঁহার সংস্কৃতসাহিত্যের চর্চা পুরাদমেই চলিয়াছিল।

রসিকদা শৈলবালার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমটা হাঁ করিয়া রহিলেন, তাহার পর হাসিতে লাগিলেন, তাহার পর রাজি হইয়া গেলেন। কহিলেন, "ভগবান হরি নারী-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভুলিয়েছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস তা হলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ বয়সটা কাটাব। কিন্তু মা যদি টের পান?"

শৈল। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখতে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু সভায় কিরকম করে সভ্যতা করতে হয়, সে আমি কিছুই জানি নে।

শৈল। আচ্ছা সে আমি চালিয়ে নেব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ ও বিপিন

শ্রীশ। তা যাই বল, অক্ষয়বাবু যখন আমাদের সভাপতি ছিলেন তখন আমাদের চিরকুমার-সভা জমেছিল ভালো। হাল সভাপতি চন্দ্রবাবু কিছু কড়া।

বিপিন। তিনি থাকতে রস কিছু বেশি জমে উঠেছিল। চিরকৌমার্যব্রতের পক্ষে রসাধিক্যটা ভালো নয় আমার তো এই মত।

শ্রীশ। আমার মত ঠিক উল্‌টো। আমাদের ব্রত কঠিন বলেই রসের দরকার বেশি। রুক্ষ মাটিতে ফসল ফলাতে গেলে কি জলসিঞ্চনের প্রয়োজন হয় না? চিরজীবন বিবাহ করব না এই প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট, তাই বলেই কি সব দিক থেকেই শুকিয়ে মরতে হবে?

বিপিন। যাই বল, হঠাৎ কুমারসভা ছেড়ে দিয়ে বিবাহ করে অক্ষয়বাবু আমাদের সভাটাকে যেন আলগা করে দিয়ে গেছেন। ভিতরে ভিতরে আমাদের সকলেরই প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেছে।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমার প্রতিজ্ঞার বল আরো বেড়েছে। যে ব্রত সকলে অনায়াসেই রক্ষা করতে পারে তার উপরে শ্রদ্ধা থাকে না।

বিপিন। একটা সুখবর দিই শোনো।

শ্রীশ। তোমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছে না কি?

বিপিন। হয়েছে বৈকি, তোমার দৌহিত্রীর সঙ্গে। ঠাট্টা রাখো, পূর্ণ কাল কুমারসভার সভ্য হয়েছে।

শ্রীশ। পূর্ণ! বল কী! তা হলে তো শিলা জলে ভাসল!

বিপিন। শিলা আপনি ভাসে না হে! তাকে আর- কিছুতে অকূলে ভাসিয়েছে। আমার যথাবুদ্ধি তার ইতিহাসটুকু সংকলন করেছি।

শ্রীশ। তোমার বুদ্ধির দৌড়টা কিরকম শুনি।

বিপিন। জানই তো, পূর্ণ সন্ধ্যাবেলায় চন্দ্রবাবুর কাছে পড়ার নোট নিতে যায়। সেদিন আমি আর পূর্ণ একসঙ্গেই একটু সকাল-সকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়েছিলেম। তিনি একটা মিটিং থেকে সবে এসেছেন। বেহারা কেরোসিন জ্বেলে দিয়ে গেছে– পূর্ণ বইয়ের পাত ওলটাচ্ছে, এমন সময়– কী আর বলব ভাই, সে বঙ্কিমবাবুর নভেল বিশেষ– একটি কন্যা পিঠে বেণী দুলিয়ে–

শ্রীশ। বল কী হে বিপিন!

বিপিন। শোনোই-না। এক হাতে থালায় করে চন্দ্রবাবুর জন্যে জলখাবার আর-এক হাতে জলের গ্লাস নিয়ে হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। আমাদের দেখেই তো কুণ্ঠিত, সচকিত, লজ্জায় মুখ রক্তিমবর্ণ। হাত জোড়া, মাথায় কাপড় দেবার জো নেই। তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর খাবার রেখেই ছুট। ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু তেত্রিশ কোটির সঙ্গে লজ্জাকে বিসর্জন দেয় নি এবং সত্য বলছি শ্রীকেও রক্ষা করেছে।

শ্রীশ। বল কী বিপিন, দেখতে ভালো বুঝি?

বিপিন। দিব্যি দেখতে। হঠাৎ যেন বিদ্যুতের মতো এসে পড়ে পড়াশুনোয় বজ্রাঘাত করে গেল।

শ্রীশ। আহা, কই, আমি তো একদিনও দেখি নি! মেয়েটি কে হে!

বিপিন। আমাদের সভাপতির ভাগ্নী, নাম নির্মলা।

শ্রীশ। কুমারী?

বিপিন। কুমারী বৈকি। তার ঠিক পরেই পূর্ণ হঠাৎ আমাদের কুমারসভায় নাম লিখিয়েছে।

শ্রীশ। পূজারি সেজে ঠাকুর চুরি করবার মতলব?

একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির প্রবেশ

বিপিন। কী মশায়, আপনি কে?

উক্ত ব্যক্তি। আজ্ঞে, আমার নাম শ্রীবনমালী ভট্টাচার্য, ঠাকুরের নাম ljকমল ন্যায়চুঞ্চু, নিবাস–

শ্রীশ। আর অধিক আমাদের ঔৎসুক্য নেই। এখন কী কাজে এসেছেন সেইটে–

বনমালী। কাজ কিছুই নয়। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়–

শ্রীশ। কাজ আপনার না থাকে আমাদের আছে। এখন, অন্য কোনো ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি আলাপ-পরিচয় করতে যান তা হলে আমাদের একটু–

বনমালী। তবে কাজের কথাটা সেরে নিই।

শ্রীশ। সেই ভালো।

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরি মশায়ের দুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে– তাঁদের বিবাহযোগ্য বয়স হয়েছে–

শ্রীশ। হয়েছে তো হয়েছে, আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কী!

বনমালী। সম্বন্ধ তো আপনারা একটু মনোযোগ করলেই হতে পারে। সে আর শক্ত কী। আমি সমস্তই ঠিক করে দেব।

বিপিন। আপনার এত দয়া অপাত্রে অপব্যয় করছেন।

বনমালী। অপাত্র! বিলক্ষণ! আপনাদের মতো সৎপাত্র পাব কোথায়। আপনাদের বিনয়গুণে আরো মুগ্ধ হলেম।

শ্রীশ। এই মুগ্ধভাব যদি রাখতে চান তা হলে এই বেলা সরে পড়ুন। বিনয়গুণে অধিক টান সয় না।

বনমালী। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে রাজি আছেন।

শ্রীশ। শহরে ভিক্ষুকের তো অভাব নেই। ওহে বিপিন, একটু পা চালিয়ে এগোও– কাঁহাতক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বকাবকি করি? তোমার আমোদ বোধ হচ্ছে, কিন্তু এরকম সদালাপ আমার ভালো লাগে না।

বিপিন। পা চালিয়ে পালাই কোথায়? ভগবান এঁকেও যে লম্বা এক জোড়া পা দিয়েছেন।

শ্রীশ। যদি পিছু ধরেন তা হলে ভগবানের সেই দান মানুষের হাতে পড়ে খোওয়াতে হবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

"মুখুজ্যেমশায়!"

অক্ষয় বলিলেন, "আজ্ঞে করো।"

শৈল কহিল, "কুলীনের ছেলে দুটোকে কোনো ফিকিরে তাড়াতে হবে।"

অক্ষয় উৎসাহপূর্বক কহিলেন, "তা তো হবেই।" বলিয়া রামপ্রসাদী সুরে গান জুড়িয়া দিলেন–

দেখব কে তোর কাছে আসে!
তুই রবি একেশ্বরী, একলা আমি রইব পাশে।

শৈল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একেশ্বরী?"

অক্ষয় বলিলেন, "নাহয় তোমরা চার ঈশ্বরীই হলে, শাস্ত্রে আছে অধিকন্তু ন দোষায়।"

শৈল কহিল, "আর, তুমিই একলা থাকবে? ওখানে বুঝি অধিকন্তু খাটে না?"

অক্ষয় কহিলেন, "ওখানে শাস্ত্রের আর-একটা পবিত্র বচন আছে– সর্বমত্যন্ত-গর্হিতং।'

শৈল। কিন্তু মুখুজ্যেমশায়, ও পবিত্র বচনটা তো বরাবর খাটবে না। আরো সঙ্গী জুটবে।

অক্ষয় বলিলেন, "তোমাদের এই একটি শালার জায়গায় দশশালা বন্দোবস্ত হবে? তখন আবার নূতন কার্যবিধি দেখা যাবে। ততদিন কুলীনের ছেলেটেলেগুলোকে ঘেঁষতে দিচ্ছি নে!"

এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল, দুটি বাবু আসিয়াছে। শৈল কহিল, "ঐ বুঝি তারা এল। দিদি আর মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাঁদের অবকাশ হবার পূর্বেই ওদের কোনোমতে বিদায় করে দিয়ো।"

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “কী বকশিশ মিলবে?”

শৈল কহিল, “আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে শালীবাহন রাজা খেতাব দেব।”

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেণ্ড?

শৈল। সেকেণ্ড হতে যাবে কেন? সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট।

অক্ষয়। বল কী? আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন সাল প্রচলিত হবে? এই বলিয়া অত্যন্ত সাড়ম্বর তান-সহকারে ভৈরবীতে গান ধরিলেন–

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক!

দেবে লিখে রাজার টিকে প্রসন্ন ওই চোখ!

শৈলবালার প্রস্থান। ভৃত্য আদিষ্ট হইয়া দুটি ভদ্রলোককে উপস্থিত করিল। একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুট-জুতা পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালী-পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা– বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুশি হইতে পারে। আর একটি বেঁটেখাটো, অত্যন্ত দাড়ি-গোঁফ-সংকুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালোকোলো, গোলগাল।

অক্ষয় অত্যন্ত সৌহার্দ্যসহকারে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া প্রবল বেগে শেকহ্যাণ্ড করিয়া দুটি ভদ্রলোকের হাত প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন, “আসুন মিস্টার ন্যাথানিয়াল, আসুন মিস্টার জেরেমায়া, বসুন বসুন! ওরে বরফ-জল নিয়ে আয় রে, তামাক দে!”

রোগা লোকটি সহসা বিজাতীয় সম্ভাষণে সংকুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, “আজ্ঞে, আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলি।”

বেঁটে লোকটি বলিল, “আমার নাম শ্রীদারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়।”

অক্ষয়। ছি মশায়! ও নামগুলো এখনো ব্যবহার করেন বুঝি? আপনাদের ক্রিশ্চান নাম? আগন্তুকদিগকে হতবুদ্ধি নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন, "এখনো বুঝি নামকরণ হয় নি? তা, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, ঢের সময় আছে।"

বলিয়া নিজের গুড়গুড়ির নল মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে অগ্রসর করিয়া দিলেন। সে লোকটা ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! আমার সামনে আবার লজ্জা! সাত বছর বয়স থেকে লুকিয়ে তামাক খেয়ে পেকে উঠেছি। ধোঁওয়া লেগে লেগে বুদ্ধিতে ঝুল পড়ে গেল! লজ্জা যদি করতে হয় তা হলে আমার তো আর ভদ্রসমাজে মুখ দেখাবার জো থাকে না।"

তখন সাহস পাইয়া দারুকেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ফস করিয়া নল কাড়িয়া লইয়া ফড় ফড় শব্দে টানিতে আরম্ভ করিল। অক্ষয় পকেট হইতে কড়া বর্মা চুরোট বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলেন। যদিচ তাহার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সে সদ্যস্থাপিত ইয়ার্কির খাতিরে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিল এবং কোনো গতিকে কাসি চাপিয়া রাখিল।

অক্ষয় কহিলেন, "এখন কাজের কথাটা শুরু করা যাক। কী বলেন?"

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল, দারুকেশ্বর বলিল, "তা নয় তো কী? শুভস্য শীঘ্রং!" বলিয়া হাসিতে লাগিল, ভাবিল, ইয়ার্কি জমিতেছে।

তখন অক্ষয় গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুর্গি না মটন!"

মৃত্যুঞ্জয় অবাক হইয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল। দারুকেশ্বর কিছু না বুঝিয়া, অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুব্ধ লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এরা দুজন তো বেশ জমাইয়াছে, আমিই নিরেট বোকা!

অক্ষয় কহিলেন, “আরে মশায়, নাম শুনেই হাসি! তা হলে তো গন্ধে অজ্ঞান এবং পাতে পড়লে মারাই যাবেন! তা, যেটা হয় মন স্থির করে বলুন– মুর্গি হবে না মটন হবে?”

তখন দুজনে বুঝিল, আহারের কথা হইতেছে। ভীরু মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল। দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় এক বার চারি দিকে চাহিয়া দেখিল।

অক্ষয় কহিলেন, “ভয় কিসের মশায়? নাচতে বসে ঘোমটা?”

শুনিয়া দারুকেশ্বর দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, তা, “মুর্গিই ভালো, কটলেট! কী বলেন?”

লুব্ধ মৃত্যুঞ্জয় সাহস পাইয়া বলিল, “মটনটাই বা মন্দ কী ভাই! চপ–”

বলিয়া আর কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

অক্ষয়। ভয় কী দাদা, দু-ই হবে! দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না।

চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, “ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমদ্দি খানসামাকে ডেনে আন্ দেখি।”

তাহার পর অক্ষয় বুড়ো আঙুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, “বিয়ার না শেরি?”

মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া মুখ বাঁকাইল। দারুকেশ্বর সঙ্গীটিকে বদরসিক বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া কহিল, “হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি?”

অক্ষয় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন, “নেই তো কী? বেঁচে আছি কী করে?”

বলিয়া যাত্রার সুরে গাহিয়া উঠিলেন–

অভয় দাও তো বলি আমার wish কী,
একটি ছটাক সোডার জলে পাকি তিন পোয়া হুইস্কি!

ক্ষীণপ্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্তব্য বোধ করিল এবং দারুকেশ্বর ফস করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ বাজাইতে আরম্ভ করিল।

অক্ষয় দু-লাইন গাহিয়া থামিবামাত্র দারুকেশ্বর বলিল, "দাদা, ওটা শেষ করে ফেলো!" বলিয়া নিজেই ধরিল, "অভয় দাও তো বলি আমার wish কী।" মৃত্যুঞ্জয় মনে মনে তাহাকে বাহাদুরি দিতে লাগিল।

অক্ষয় মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া কহিলেন, "ধরো না হে, তুমিও ধরো!"

সলজ্জ মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল– অক্ষয় ডেস্ক চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। এক জায়গায় হঠাৎ থামিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এ দিকে তো সব ঠিক– এখন আপনারা কী হলে রাজি হন?"

দারুকেশ্বর কহিল, "আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।"

অক্ষয় কহিলেন, "সে তো হবেই। তার না কাটলে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে? দেশে আপনাদের মতো লোকের বিদ্যেবুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাটলেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছলে উঠবে।"

দারুকেশ্বর অত্যন্ত খুশি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্ছে। বুঝলে?"

অক্ষয় কহিলেন, "সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্‌টাইজ আজই তো হবেন?"

দারুকেশ্বর ভাবিল, ঠাট্টাটা বোঝা যাইতেছে না। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, "সেটা কিরকম?"

অক্ষয় কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাবে কহিলেন, "কেন, কথাই তো আছে, রেভারেণ্ড্ বিশ্বাস আজ রাত্রেই আসছেন। ব্যাপ্‌টিজ্‌ম্ না হলে তো ক্রিশ্চান মতে বিবাহ হতে পারে না!"

মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল, "ক্রিশ্চান মতে কী মশায়?"

অক্ষয় কহিলেন, "আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন! সে হচ্ছে না– ব্যাপ্‌টাইজ যেমন করে হোক, আজ রাত্রেই সারতে হচ্ছে। কিছুতেই ছাড়ব না।"

মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা ক্রিশ্চান না কি?"

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত ভীতভাবে কহিল, "মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোওয়াতে পারব না।"

অক্ষয় হঠাৎ অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে কহিলেন, "জাত কিসের মশায়! এ দিকে কলিমদ্দির হাতে মুর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত!"

মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া কহিল, "চুপ, চুপ, চুপ করুন! কে কোথা থেকে শুনতে পাবে।"

তখন দারুকেশ্বর কহিল, "ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ করে দেখি!"

বলিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিল, "বিলেত থেকে ফিরে সেই তো একবার প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে– তখন ডবল প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘটে উঠবে না। দেখলি তো কোনো শ্বশুরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিশ্চানের হুঁকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিশ্চান হতে আর বাকি কী রইল?" এই বলিয়া অক্ষয়ের কাছে আসিয়া কহিল, "বিলেত যাওয়াটা তো নিশ্চয় পাকা? তা হলে ক্রিশ্চান হতে রাজি আছি।"

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, "কিন্তু আজ রাতটা থাক্‌।"

দারুকেশ্বর কহিল, "হতে হয় তো চট্‌পট্‌ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভালো– গোড়াতেই বলেছি, শুভস্য শীঘ্রং।"

ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম। দুই থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ-জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। ক্ষুণ্ন দারুকেশ্বর কহিল, "কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি বেটা উড়েই গেল নাকি? কট্‌লেট কোথায়?"

অক্ষয় মৃদুস্বরে বলিলেন, "আজকের মতো এইটেই চলুক।"

দারুকেশ্বর কহিল, "সে কি হয় মশায়! আশা দিয়ে নৈরাশ! শ্বশুরবাড়ি এসে মটন চপ খেতে পাব না? আর এ যে বরফ-জল মশায়, আমার আবার সর্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না।" বলিয়া গান জুড়িয়া দিল, "অভয় দাও তো বলি আমার wish কী" ইত্যাদি। অক্ষয় মৃত্যুঞ্জয়কে কেবলই টিপিতে লাগিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিতে লাগিলেন, "ধরো না হে, তুমিও ধরো না– চুপচাপ কেন।" সে ব্যক্তি কতক ভয়ে কতক লজ্জায় মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল। গানের উচ্ছ্বাস থামিলে অক্ষয় আহারপাত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিতান্তই কি এটা চলবে না?"

দারুকেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না মশায়, ও-সব রুগীর পথ্যি চলবে না! মুর্গি না খেয়েই তো ভারতবর্ষ গেল!" বলিয়া ফড়ফড় করিয়া গুড়গুড়ি টানিতে লাগিল।

অক্ষয় কানের কাছে আসিয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরিতে ধরাইয়া দিলেন–

কত কাল রবে বলো ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।

শুনিয়া দারুকেশ্বর উৎসাহ-সহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল।

অক্ষয় আবার কানে কানে ধরাইয়া দিলেন–

দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন,
ধরো হুইস্কি সোডা আর মুর্গিমটন।

অমনি দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া ঊর্ধ্বস্বরে ঐ পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ও কোনোমতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল।

অক্ষয় পুনশ্চ ধরাইয়া দিলেন–

যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,

এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা!

যতই উৎসাহসহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উসখুস শব্দ শুনা যাইতে লাগিল এবং অক্ষয় নিরীহ ভালোমানুষটির মতো মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারুকেশ্বর উৎসাহিত হইয়া কহিল, "এই-যে চাচা! আজ রান্নাটা কী হয়েছে বলো দেখি।"

সে অনেকগুলা ফর্দ দিয়া গেল। দারুকেশ্বর কহিল, "কোনোটাই তো মন্দ শোনাচ্ছে না হে। (অক্ষয়ের প্রতি) মশায়, কী বিবেচনা করেন? ওর মধ্যে বাদ দেবার কি কিছু আছে?"

অক্ষয় অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন "সে আপনারা যা ভালো বোঝেন!"

দারুকেশ্বর কহিল, "আমার তো মত, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলে সব-কটাকেই আদর করে নিই।"

অক্ষয়। তা তো বটেই, ওঁরা সকলেই পূজ্য।

কলিমদ্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়রা কি তা হলে আজ রাত্রেই ক্রিশ্চান হতে চান?"

খানার আশ্বাসে প্রফুল্লচিত্তে দারুকেশ্বর কহিল, "আমার তো কথাই আছে, শুভস্য শীঘ্রং। আজই ক্রিশ্চান হব, এখনই ক্রিশ্চান হব, ক্রিশ্চান হয়ে তবে অন্য কথা। মশায়, আর ঐ

পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না। আনুন আপনার পাদ্রি ডেকে।” বলিয়া পুনশ্চ উচ্চস্বরে গান ধরিল–

যাও ঠাকুর চৈতন চুটকি নিয়া,
এসো দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা!

চাকর আসিয়া অক্ষয়ের কানে কানে কহিল, “মাঠাকরুন একবার ডাকছেন।”

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেলে জগত্তারিণী কহিলেন, “এ কী! কাণ্ডটা কী?”

অক্ষয় গম্ভীরমুখে কহিলেন, “মা, সে-সব পরে হবে, এখন ওরা হুইস্কি চাচ্ছে, কী করি? তোমার পায়ে মালিশ করবার জন্যে সেই-যে ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে?”

জগত্তারিণী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, “বল কী বাছা? ব্রাণ্ডি খেতে দেবে?”

অক্ষয় কহিলেন, “কী করব মা, শুনেইছ তো, ওর মধ্যে একটি ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দি হয়, মদ না খেলে আর-একটির মুখে কথাই বের হয় না।”

জগত্তারিণী কহিলেন, “ক্রিশ্চান হবার কথা কী বলছে ওরা?”

অক্ষয় কহিলেন, “ওরা বলছে হিঁদু হয়ে খাওয়া-দাওয়ার বড়ো অসুবিধে, পুঁইশাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে ওদের অসুখ করে!”

জগত্তারিণী অবাক হইয়া কহিলেন, “তাই বলে কি ওদের আজ রাতেই মুর্গি খাইয়ে ক্রিশ্চান করবে নাকি?”

অক্ষয় কহিলেন, “তা, মা, ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দুটি পাত্র এখনই হাতছাড়া হবে। তাই ওরা যা বলছে তাই শুনতে হচ্ছে, আমাকে সুদ্ধ মদ ধরাবে দেখছি।”

পুরবালা কহিলেন, “বিদায় করো, বিদায় করো, এখনই বিদায় করো।”

জগত্তারিণী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া-টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিককাকাকে পাত্র সন্ধান করতে দিয়েছিলুম। তাঁর দ্বারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়।"

রমণীগণের প্রস্থান। অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অক্ষয়ের অবর্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মৃত্যুঞ্জয় রাগের স্বরে বলিয়া উঠিল, "না মশায়, আমি ক্রিশ্চান হতে পারব না, আমার বিয়ে করে কাজ নেই।"

অক্ষয় কহিলেন, "তা, মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করছে।"

দারুকেশ্বর কহিল, "আমি রাজি আছি মশায়।"

অক্ষয় কহিলেন, "রাজি থাকেন তো গির্জায় যান-না মশায়। আমার সাত পুরুষে ক্রিশ্চান করা ব্যবসা নয়!"

দারুকেশ্বর কহিল, "ঐ-যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বললেন–"

অক্ষয়। তিনি টেরিটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দারুকেশ্বর। তা হলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায়? খাওয়াটাও কি–

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্তত হোটেলে–

অক্ষয়। সে কথা ভালো।– বলিয়া টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া দুটিকে বিদায় করিয়া দিলেন।

তখন নৃপর হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দমকা হাওয়ার মতো ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। কহিল, “মুখুজ্যেমশায়, দিদি তো দুটির কোনোটিকেই বাদ দিতে চান না!”

নৃপ তাহার কপোলে গুটি দু-তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া কহিল, “ফের মিথ্যে কথা বলছিস?”

অক্ষয়। ব্যস্ত হোস নে ভাই, সত্যমিথ্যের প্রভেদ আমি একটু একটু বুঝতে পারি।

নীরবালা। আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, এ দুটি কি রসিকদাদার রসিকতা, না আমাদের সেজদিদিরই ফাঁড়া?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে? প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্টিস করছিলেন, এ দুটো ফসকে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্বে তোমার দিদির ছিপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বঁড়শি বিঁধল কেবল আমারই কপালে।

বলিয়া কপালে চপেটাঘাত করিলেন।

নৃপবালা। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্টিস চলবে না কি মুখুজ্যেমশায়? তা হলে তো আর বাঁচা যায় না!

নীরবালা। কেন ভাই, দুঃখ করিস? রোজই কি ফসকাবে? একটা না একটা এসে ঠিকমতন পৌঁছবে।

রসিকের প্রবেশ

নীরবালা। রসিকদাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী জোটাচ্ছি।

রসিক। সে তো সুখের বিষয়।

নীরবালা। হাঁ! সুখ দেখিয়ে দেব! তুমি থাক হোগলার ঘরে, আর পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও। আমাদের হাতে টিকে নেই? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ তা হলে তোমার দু-দুটো বিয়ে দিয়ে দেব– মাথায় যে-কটি চুল আছে সামলাতে পারবে না!

রসিক। দেখ্ দিদি, দুটো আস্ত জন্তু এনেছিলুম বলেই তো রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রকমের হত তা হলেই তো বিপদ ঘটত। যাকে জন্তু বলে চেনা যায় না সেই জন্তুই ভয়ানক।

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলোবামাত্রই চট্‌পট্ শব্দে লেজ নড়ে উঠল। কিন্তু মা বলছেন কী?

রসিক। সে যা বলছেন সে আর পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মতো নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম। যা হোক, শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীরবালা। বল কী রসিকদাদা! তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নতুন নতুন নমুনো দেখা বন্ধ?

নৃপবালা। তোর এখনো শখ আছে নাকি?

নীরবালা। এ কি শখের কথা হচ্ছে? এ হচ্ছে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে জিনিসটা সহজ হয়ে আসবে, যেটিকে বিয়ে করবি সেই প্রাণীটিকে বুঝতে কষ্ট হবে না।

নৃপবালা। তোমার প্রাণীকে তুমি বুঝে নিয়ো, আমার জন্যে তোমার ভাবতে হবে না।

নীরবালা। সেই কথাই ভালো– তুইও নিজের জন্যে ভাবিস, আমিও নিজের জন্য ভাবব, কিন্তু রসিকদাদাকে আমাদের জন্যে ভাবতে দেওয়া হবে না।

নৃপ নীরুকে বলপূর্বক টানিয়া লইয়া গেল। শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "রসিকদা, তোমার তো মার সঙ্গে কাশী গেলে চলবে না। আমরা যে চিরকুমার-সভার সভ্য হব– আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি।"

অক্ষয় কহিলেন, "মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সেজন্যে ভাবনা নেই।"

শৈল। এই-যে মুখুজ্যেমশায়। তুমি তাদের কি বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে! শেষকালে বেচারাদের জন্যে আমার মায়া করছিল।

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা পরমা প্রকৃতি নিজেই বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই। যেমন কবি হওয়া আর-কি। লেজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।

পুরবালা প্রবেশ করিয়া কেরোসিন ল্যাম্পটা লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল, "বেহারা কিরকম আলো দিয়ে গেছে, মিট্‌মিট্‌ করছে। ওকে বলে বলে পারা গেল না।"

অক্ষয়। সে বেটা জানে কিনা অন্ধকারেই আমাকে বেশি মানায়।

পুরবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্ছে না কি? এটা তো নতুন দেখছি।

অক্ষয়। আমি বলছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেছে।

পুরবালা। ওঃ, তাই ভালো। তা, ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও!– কিন্তু রসিকদাদা, আজ কী কাণ্ডটাই করলে।

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায়, কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না– সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুরবালা। সে উদাহরণ না দেখিয়ে দুটো-একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই তো ভালো হত।

শৈল। সে ভার আমি নিয়েছি দিদি।

পুরবালা। তা আমি বুঝেছি। তুমি আর তোমার মুখুজ্যেমশায় মিলে কদিন ধরে যেরকম পরামর্শ চলছে, একটা কী কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড তো আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্ছে, চিরকুমার-সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

পুরবালা। শৈল তার মধ্যে কে?

রসিক। হনুমান তো নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হচ্ছেন স্বয়ং আগুন।

রসিক। এক ব্যক্তি ওঁকে লেজে করে নিয়ে যাবেন।

পুরবালা। আমি কিছু বুঝতে পারছি নে। শৈল, তুই চিরকুমার-সভায় যাবি না কি।

শৈল। আমি যে সভ্য হব।

পুরবালা। কী বলিস তার ঠিক নেই! মেয়েমানুষ আবার সভ্য হবে কী!

শৈল। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে| তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপকান ধরব ঠিক করেছি।

পুরবালা। বুঝেছি, ছদ্মবেশে সভ্য হতে যাচ্ছিস বুঝি। চুলটা তো কেটেইছিস, ঐটেই বাকি ছিল। তোমাদের যা খুশি করো, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না না, তুমি এ দলে ভিড়ো না! আর যার খুশি পুরুষ হোক, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকো– নইলে ব্রীচ অফ কন্‌ট্রাক্‌ট্– সে বড়ো ভয়ানক মকদ্দমা!– বলিয়া সিন্ধুতে গান ধরিলেন–

চির-পুরানো চাঁদ!

চিরদিবস এমনি থেকো আমার এই সাধ।
পুরানো হাসি পুরানো সুধা, মিটায় মম পুরানো ক্ষুধা–
নূতন কোনো চকোর যেন পায় না পরসাদ!

পুরবালা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, “ভয় নেই। রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে– একটু অনুতাপও হবে– সেইটেই সুযোগের সময়।”

রসিক।
কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা নিগ্রহো যত্র মৌনং।
যত্রান্যোন্যস্মিতমনুনয় যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ।

শৈল। রসিকদাদা, তুমি তো দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেছ– কোপ জিনিসটা কী, তা মুখুজ্যেমশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি। মুখুজ্যেমশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমার উপরেই যদি কোপ পড়ত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতুম। কিন্তু দিদি, ঐ জলখাবারের থালা দুটি তো মান করে নি, বসে গেলে বোধ হয় আপত্তি নেই?

অক্ষয়। ঠিক ঐ কথাটাই ভাবছিলুম।

উভয়ে আহারে উপবেশন করিলেন, শৈলবালা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আহারের পর শৈলবালা ডাকিল, “মুখুজ্যেমশায়।”

অক্ষয় অত্যন্ত ত্রস্তভাব দেখাইয়া কহিলেন, “আবার মুখুজ্যেমশায়! এই বালখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ-ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই।”

শৈলবালা। ধ্যানভঙ্গ আমরা করব। কেবল মুনিকুমারগুলিকে এই বাড়িতে আনা চাই।

অক্ষয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, “সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত করে আনতে হবে। যত দুঃসাধ্য কাজ সবই এই একটিমাত্র মুখুজ্যেমশায়কে দিয়ে?”

শৈলবালা হাসিয়া কহিল, “মহাবীর হবার ঐ তো মুশকিল। যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল-নীল-অঙ্গদকে তো কেউ পোঁছেও নি!”

অক্ষয় গর্জন করিয়া কহিলেন, “ওরে পোড়ারমুখী ত্রেতাযুগের পোড়ারমুখোকে ছাড়া আর কোনো উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!”

শৈলবালা কহিল, “হাঁ গো, এতই প্রেম!”

অক্ষয় ভৈরোঁতে গাহিয়া উঠিলেন–

“পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে!
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে!

আচ্ছা, তাই হবে! পঙ্গপাল কটাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আসব। তা হলে চট্ করে আমাকে একটা পান এনে দাও। তোমার স্বহস্তের রচনা!”

শৈল। কেন দিদির হস্তের–

অক্ষয়। আরে, দিদির হস্ত তো জোগাড় করেইছি, নইলে পাণিগ্রহণ কী জন্যে? এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে।

শৈল। আচ্ছা গো মশায়! পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুন মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ার মুখ আবার পুড়বে।

অক্ষয় গাহিলেন–

যারে মরণ দশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

শৈল। মুখুজ্যেমশায়, ও কাগজের গোলাটা কিসের?

অক্ষয়। তোমাদের সেই সভ্য হবার আবেদনপত্র এবং প্রবেশিকার দশ টাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এমনি পরিষ্কার করে দিয়েছে, একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্ছি নে। ও বেটা বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ঐ পত্রটা একেবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈল। এই বুঝি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মরণশক্তি জুড়ে বসে আছ, আর কিছু কি মনে রাখতে দিলে?–

সকলি ভুলেছে ভোলা মন
ভোলে নি ভোলে নি শুধু ওই চন্দ্রানন।

১০ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে একতলার একটি ঘরে চিরকুমার-সভার অধিবেশন হয়। বাড়িটি সভাপতি চন্দ্রমাধববাবুর বাসা। তিনি লোকটি ব্রাহ্ম কালেজের অধ্যাপক। দেশের কাজে অত্যন্ত উৎসাহী; মাতৃভূমির উন্নতির জন্য ক্রমাগতই নানা মতলব তাঁহার মাথায়

আসিতেছে। শরীরটি কৃশ কিন্তু কঠিন, মাথাটা মস্ত, বড়ো দুইটি চোখ অন্যমনস্ক খেয়ালে পরিপূর্ণ। প্রথমটা সভায় সভ্য অনেকগুলি ছিল। সম্প্রতি সভাপতি বাদে তিনটিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। যুথভ্রষ্টগণ বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়া রোজগারে প্রবৃত্ত। এখন তাঁহারা কোনোপ্রকার চাঁদার খাতা দেখিলেই প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহাতেও খাতাধারী টিকিয়া থাকিবার লক্ষণ প্রকাশ করিলে গালি দিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষীর প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা জন্মিয়াছে।

বিপিন শ্রীশ এবং পূর্ণ তিনটি সভ্য কালেজে পড়িতেছে, এখনো সংসারে প্রবেশ করে নাই। বিপিন ফুটবল খেলে, তাহার শরীরে অসামান্য বল, পড়াশুনা কখন করে কেহ বুঝিতে পারে না, অথচ চট্‌পট্‌ একজামিন পাস করে। শ্রীশ বড়োমানুষের ছেলে, স্বাস্থ্য তেমন ভালো নয়, তাই বাপ-মা পড়াশুনার দিকে তত বেশি উত্তেজনা করেন না– শ্রীশ নিজের খেয়াল লইয়া থাকে। বিপিন এবং শ্রীশের বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য।

পূর্ণ গৌরবর্ণ, একহারা, লঘুগামী, ক্ষিপ্রকারী, দ্রুতভাষী, সকল বিষয়ে গাঢ় মনোযোগ, চেহারা দেখিয়া মনে হয় দৃঢ়সংকল্প কাজের লোক।

সে ছিল চন্দ্রমাধববাবুর ছাত্র। ভালোরূপ পাস করিয়া ওকালতি-দ্বারা সুচারুরূপ জীবিকা নির্বাহ করিবার প্রত্যাশায় সে রাত জাগিয়া পড়া করে। দেশের কাজ লইয়া নিজের কাজ নষ্ট করা তাহার সংকল্পের মধ্যে ছিল না। চিরকৌমার্য তাহার কাছে অত্যন্ত মনোহর বলিয়া বোধ হইত না। সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত আসিয়া চন্দ্রবাবুর নিকট হইতে পাস করিবার উপযুক্ত নোট লইত; এবং সে মনে মনে নিশ্চয় জানিত যে, চিরকৌমার্যব্রত না লওয়াতে এবং নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করিবার জন্য লেশমাত্র ব্যগ্র না হওয়াতে তাহার প্রতি চন্দ্রমাধববাবুর শ্রদ্ধামাত্র ছিল না, কিন্তু সেজন্য সে কখনো অসহ্য দুঃখানুভব করে নাই। তার পরে কী ঘটিল তাহা সকলেই জানেন।

সেদিন সভা বসিয়াছে। চন্দ্রমাধববাবু বলিতেছেন, "আমাদের এই সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারো হতাশ্বাস হবার কোনো কারণ নেই–"

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই রুগ্ণকায় উৎসাহী শ্রীশ বলিয়া উঠিল, "হতাশ্বাস! সেই তো আমাদের সভার গৌরব! এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিন বিধান কি সর্বসাধারণের উপযুক্ত! আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।"

চন্দ্রমাধববাবু কার্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্তব্য; সর্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সংকল্প-সাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখো পূর্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়তো আমাদের চেয়ে সর্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আমাদের কয়জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করছে তা কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব, এবং কোনোরকম শপথেও বদ্ধ হতে চাই নে– আমাদের মত এই যে, কোনোকালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হওয়া ভালো।"

পাশের ঘরে ঈষৎ মুক্ত দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছায় দুই-একটা চাবি যে একটু ঠুন শব্দ করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

চন্দ্রমাধববাবু বলিতে লাগিলেন, "আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন; অনেকে বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্য কৌমার্যব্রত গ্রহণ করছ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হলে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে

থাকবে যার জন্যে কোনো কাজ করা কারো দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরুত্তরে এই-সকল পরিহাস বহন করি; কিন্তু এর কি কোনো উত্তর নেই?”

বলিয়া তিনি তাঁহার তিনটি মাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন।

পূর্ণ নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে কহিল, “আছে বৈকি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করে নি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই কটিকে আকর্ষণ করে এক-উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা, সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্যব্রতে দীক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি-চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তোমরাই কি সেই দুটি-চারটি লোক, তবে স্পর্ধাপূর্বক কে নিশ্চয়রূপে বলতে পারে। হাঁ আমরা জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্যন্ত, কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্যন্ত টিকতে পারব কি না তা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা কেউ টিকতে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্খলিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারো নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতিমশায় একলা মাত্র থাকেন তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃপ্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে, এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনোই ব্যর্থ হবে না।”

কুণ্ঠিত সভাপতি কার্যবিবরণের খাতাখানি পুনর্বার তাঁহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে কী দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণর এই বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রমাধববাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্মলার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোছার ঝনক-শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পুরস্কৃত করিল।

বিপিন চুপ করিয়া ছিল, এতক্ষণ পরে সে তাহার জলদমন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোনো এক সময়ে শুরু করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই– কী করতে হবে?"

চন্দ্রমাধব উজ্জ্বল উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই প্রশ্নের জন্য আমরা এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম, কী করতে হবে? এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কী করতে হবে? বন্ধুগণ, কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। একসঙ্গে যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিনবাবু আজ এই যে প্রশ্ন করেছেন– কী করতে হবে– এই প্রশ্নকে নিবতে দেওয়া হবে না। সভ্যমহাশয়গণ, আপনারা উত্তর করুন কী করতে হবে?"

দুর্বলদেহ শ্রীশ অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন কী করতে হবে, আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত নিয়ে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট করে তুলতে হবে, আমাদের সভাটিকে সূক্ষ্ম সূত্রস্বরূপ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেঁথে ফেলতে হবে।"

বিপিন হাসিয়া কহিল, "সে ঢের সময় আছে, যা কালই শুরু করা যেতে পারে এমন একটা কিছু কাজ বলো। "মারি তো গণ্ডার লুঠি তো ভাণ্ডার' যদি পণ করে বস তবে গণ্ডারও বাঁচবে ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি আমরা প্রত্যেকে দুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়াশুনো এবং শরীর-মনের সমস্ত চর্চার ভার আমাদের উপর থাকবে।"

শ্রীশ কহিল, "এই তোমার কাজ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি! শেষকালে ছেলে মানুষ করতে হবে, তা হলে নিজের ছেলে কী অপরাধ করেছে!"

বিপিন বিরক্ত হইয়া কহিল, "তা যদি বল তা হলে সন্ন্যাসীর তো কর্মই নেই; কর্মের মধ্যে ভিক্ষে আর ভ্রমণ আর ভণ্ডামি।"

শ্রীশ রাগিয়া কহিল, "আমি দেখছি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এ সভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল!"

বিপিন আরক্তবর্ণ হইয়া বলিল, "নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই নে কিন্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন যাঁরা সন্ন্যাসগ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগস্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের–"

চন্দ্রমাধববাবু চোখের কাছ হইতে কার্যবিবরণের খাতা নামাইয়া কহিলেন, "উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণবাবুর অভিপ্রায় জানতে পারলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।"

পূর্ণ কহিল, "অদ্য বিশেষরূপে সভার ঐক্যবিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কিরকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বসি তা হলে বিরোধানলে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে– অতএব আমার প্রস্তাব এই যে, সভাপতিমশায় আমাদের কাজ নির্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব। কার্যসাধন এবং ঐক্যসাধনের এই একমাত্র উপায় আছে।"

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহার চাবি ঝন্ করিয়া উঠিল!

বিষয়কর্মে চন্দ্রমাধববাবুর মতো অপটু কেহ নাই কিন্তু তাঁহার মনের খেয়াল বাণিজ্যের দিকে। তিনি বলিলেন, "আমাদের প্রথম কর্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র৻মোচন এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে বড়ো বাণিজ্য চালাতে পারি নে, কিন্তু তার সূত্রপাত করতে পারি। মনে করো আমরা সকলেই যদি দিয়াশলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাঠি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, তা হলে দেশে সস্তা দেশলাই নির্মাণের কোনো বাধা থাকে না।" এই বলিয়া জাপানে এবং য়ুরোপে সবসুদ্ধ কত দেশলাই প্রস্তুত হয়, তাহাতে কোন্ কোন্ কাঠের কাঠি ব্যবহার হয়, কাঠির সঙ্গে কী কী দাহ্য পদার্থ মিশ্রিত করে, কোথা হইতে কত দেশালাই রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যে কত ভারতবর্ষে আসে এবং তাহার মূল্য কত চন্দ্রমাধববাবু তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন।

বিপিন শ্রীশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পূর্ণ কহিল, "পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেখব।"

শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

এমন সময় ঘরের মধ্যে অক্ষয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, "মশায়, প্রবেশ করতে পারি?"

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। অক্ষয় কহিলেন, "মশায়, ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রূকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না– আমি অভূতপূর্ব নই– এমন-কি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব– আমার নাম–"

চন্দ্রমাধববাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিলেন, "আর নাম বলতে হবে না– আসুন আসুন অক্ষয়বাবু–"

তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল। বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সদ্যোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। পূর্ণ কহিল, "মশায়, অভূতপূর্বর চেয়ে ভূতপূর্বকেই বেশি ভয় হয়।"

অক্ষয় কহিলেন, "পূর্ণবাবু বুদ্ধিমানের মতো কথাই বলেছেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্যলোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ংকর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার-সভার ভূতটিকে সভা থেকে ঝাড়াবেন না পূর্ব-সম্পর্কের মমতাবশত একখানা চৌকি দেবেন, এইবেলা বলুন।"

"চৌকি দেওয়াই স্থির" বলিয়া চন্দ্রবাবু একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন।

"সর্বসম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলুম" বলিয়া অক্ষয়বাবু বসিলেন; বলিলেন, "আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা করে বসতে বললেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাকব আমাকে এমন অসভ্য মনে করবেন না– বিশেষত পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়মবিরুদ্ধ, অথচ ঐ তিনটে বদ অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে, সুতরাং চট্‌পট্‌ কাজের কথা সেরেই বাড়িমুখো হতে হবে।"

চন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, "আপনি যখন সভ্য নন তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম না-ই খাটালেম– পান-তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব, কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই–"

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়!

চন্দ্রবাবু পান-তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন। পূর্ণ কহিল, "আমি ডাকিয়া দিতেছি।" বলিয়া উঠিল; পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল।

অক্ষয় তাহাকে থামাইয়া কহিলেন, "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ। যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার– কোনো প্রভেদ নেই। এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন।"

চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন।

অক্ষয় কহিলেন, "আমার কোনো মফস্বলের ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমারসভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেছেন।"

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!"

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন– বিবাহ সে কোনোক্রমেই করবে না, আমি তার জামিন রইলুম। তার দূরসম্পর্কের এক দাদাসুদ্ধ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মতো সুকুমার নন, কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশি কুমার, তাঁর বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে– সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সৌভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবে চিরকুমার-সভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সভাপতি কহিলেন, "সভ্যপদপ্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণ–"

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই– সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করতে পারা যাবে না– সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ-সুদ্ধই পাবেন। কিন্তু

আপনাদের এই একতলার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়; আপনাদের এই চিরকুমার ক'টির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সে দিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন।

চন্দ্রবাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "অক্ষয়বাবু, আপনি জানেন তো আমাদের আয়–"

অক্ষয়। আয়ের কথাটা আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্তপ্রফুল্লকর নয়। ভালো ঘরের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে সেজন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চলুন-না আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

বিমর্ষ বিপিন-শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্য দিয়া বার বার আঙুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল। সে বলিল, "সভার স্থান-পরিবর্তনটা কিছু নয়।" অক্ষয় কহিলেন, "কেন, এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি করলেই কি আপনাদের চির-কৌমার্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে?"

পূর্ণ। এ-ঘরটি তো আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়। কিন্তু এর চেয়ে ভালো ঘর শহরে দুষ্প্রাপ্য হবে না।

পূর্ণ। আমার তো মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভালো।

শ্রীশ কহিল, "সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।"

বিপিন কহিল, "একটা কাজে প্রবৃত্ত হলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।"

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোনো, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্য ব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়ো না। আলোক এবং বাতাস স্ত্রীলিঙ্গ নয়, অতএব সভার মধ্যে ও-

দুটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ো না। আরো বিবেচনা করে দেখো, এ স্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত নয়। বাতিকের চর্চা করছ করো, কিন্তু বাতের চর্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কী বল, শ্রীশবাবু বিপিনবাবুর কী মত?

দুই বন্ধু বলিল, “ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক-না।”

পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নিরুত্তর রহিল। পাশের ঘরেও চাবি একবার ঠুন করিল, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন সুরে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অক্ষয় বলিলেন, "স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না?"

পুরবালা। আমি কী পণ্ডিতমশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি? আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সুখবর নয়– শোনবামাত্র তোমাকে শাল-দোশালা বকশিশ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে না।

পুরবালা। ইস, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে– না? সহ্য করতে পারছ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদের কথা ভাবছি নে– এখন তুমি দুদিন না রইলে, আরো কজন রয়েছেন, একরকম করে এই হতভাগ্যের চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কী হবে? দেখো, ধর্মকর্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না– স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রোমোশন পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাকব– তোমাকে বিষ্ণুদূতে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদূতে কানে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে–

গান। পরজ

স্বর্গে তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,
পিছে পিছে আমি চলব খুঁড়িয়ে।
ইচ্ছা হবে টিকির ডগা ধরে

পুরবালা। আচ্ছা, আচ্ছা, থামো।

অক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চলবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত?– নিতান্তই চললে?

পুরবালা। চললুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে?

পুরবালা। রসিকদাদার হাতে।

অক্ষয়। মেয়েমানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না। সেইজন্যেই তো বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পুরবালা। তোমাকে তো বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হবে না।

অক্ষয়। তা হবে না।

গান। কাফি

কার হাতে যে ধরা দেব প্রাণ;
তাই ভাবতে বেলা অবসান।
ডান দিকেতে তাকাই যখন, বাঁয়ের লাগি কাঁদে রে মন
বাঁয়ের লাগি ফিরলে তখন দক্ষিণেতে পড়ে টান।

আচ্ছা, আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই-তিন সদুপায় আছে, কিন্তু তুমি

বিরহ-যামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদতাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে–

পুরবালা। রক্ষে করো, ও মিলটা ঐখানেই শেষ করো।

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থামতে পারি নে– কাব্য আপনি বেরোতে থাকে। মিল ভালো না বাস অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি "আর্তনাদবধ কাব্য' বলে একটা কাব্য লিখব– সখী, তার আরম্ভটা শোনো–

(সাড়ম্বরে)বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারীচূড়ামণি
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবী অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদমাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয়!

পুরবালা। (সগর্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়, তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখো-না।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথাটা যদি বললে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুঝেছি ওটা সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ঐ কাব্য লেখা, ও কার্যটাও সুসাধ্য বলে জ্ঞান করি নে। বুদ্ধিতে আমার এক জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জমতে পারে না– ফস ফস করে বেরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে!
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে।

কিন্তু আমার প্রশ্নের তো কোনো উত্তর পেলুম না। কৌতূহলে মরে যাচ্ছি। কাশীতে যে চলেছ, উৎসাহটা কিসের জন্যে? আপাতত সেই বিষ্ণুদূতটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারি সন্দেহ হচ্ছে। শুনেছি নন্দী ও ভৃঙ্গী অনেক বিষয়ে আমাকেও যেতে, ফিরে এসে হয়তো এই ভূতটিকে পছন্দ না হতেও পারে!

অক্ষয়ের পরিহাসের মধ্যে একটু যে অভিমানের জ্বালা ছিল, সেটুকু পুরবালা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রথমে কাশী যাইবার প্রস্তাবে তাহার যে উৎসাহ হইয়াছিল, যাত্রার সময় যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল ততই তাহা ম্লান হইয়া আসিতেছে।

সে কহিল, "আমি কাশী যাব না।"

অক্ষয়। সে কী কথা! ভূতভাবনের যে ভৃত্যগুলি একবার মরে ভূত হয়েছে তারা যে দ্বিতীয় বার মরবে।

রসিকের প্রবেশ

পুরবালা। আজ যে রসিকদাদার মুখ ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্ছে?

রসিক। ভাই, তোর রসিকদাদার মুখের ঐ রোগটা কিছুতেই ঘুচল না। কথা নেই বার্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে– বিবাহিত লোকেরা দেখে মনে মনে রাগ করে।

পুরবালা। শুনলে তো, বিবাহিত লোক! এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও।

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃদ্ধ কোথা থেকে জানবে? সে এত রহস্যময় যে, তা উদ্ভেদ করতে আজ পর্যন্ত কেউ পারলে না– সে এত গভীর যে আমরাই হাতড়ে খুঁজে পাই নে, হঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পুরবালা। "এই বুঝি!" বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অক্ষয় তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া কহিল, "দোহাই তোমার, এই লোকটির সামনে রাগারাগি কোরো না– তা হলে ওর আস্পর্ধা আরো বেড়ে যাবে।– দেখো দাম্পত্য-তত্ত্বানভিজ্ঞ বৃদ্ধ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবত আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে ওঠে, সেইটেই তোমাদের কর্ণগোচর হয়; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কানের কাছে মুখ আনতে গিয়ে মুখ বারম্বার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে থাকে, তখন তো খবর পাও না!"

পুরবালা। আঃ– চুপ করো।

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে সেকরা পর্যন্ত সেটা কারো অবিদিত থাকে না, কিন্তু বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী–

পুরবালা। আঃ– থামো।

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে প্রেয়সী–

পুরবালা। আঃ– কী বকছ তার ঠিক নেই!

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জন করে বলেন, “আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার এক দণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই– আমার হাড় কালী হল– আমার–‘

পুরবালা। হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব বলে বসন্তনিশীথে গর্জন করেছে?

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই? আবার সন-তারিখ-সুদ্ধ মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে? আমি কি এতবড়ো প্রতিভাশালী?

রসিক। (পুরবালার প্রতি) বুঝেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বলতে পারে না– ওর এত ক্ষমতাই নেই– তাই উল্‌টে বলে; আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়।

পুরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেছেন।

রসিক। তা, বেশ তো, এতে আর ভয়ের কথাটা কী? তীর্থে যাবার তো বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোলকটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না– এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে–

মুগ্ধস্নিগ্ধবিদগ্ধমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং

চেতঃ সম্প্রতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ততে।

পুরবালা। সে তো খুব ভালো কথা– তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাই নে, এখন চন্দ্রচূড় চরণে চলো– তা হলে মাকে ডাকি!

রসিক। (করজোড়ে) বড়দিদি ভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা করছেন, কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কারকার্য আরম্ভ করেছেন– এখন তাঁর শাসনে কোনো ফল হবে না। বরঞ্চ এখনো নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোলকটাক্ষটা শেষকাল পর্যন্ত খাটে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্ছেন, কিছুদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ করে শান্তিতে থাকুন– কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা, তা হলে আসি।

অক্ষয়। চললে না কি মা? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ করছিলেন যে তুমি–

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা! মা, আমার কোনো দুঃখ নেই– আমি কেন দুঃখ করতে যাব?

অক্ষয়। বলছিলে না, যে, বড়োমা একলাই কাশী যাচ্ছেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না?

রসিক। হাঁ, সে তো ঠিক কথা। মনে তো লাগতেই পারে– তবে কি না মা যদি নিতান্তই–

জগত্তারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সামলাবে কে? ওঁকে নিয়ে পথ চলতে পারব না।

পুরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে শুনতে পারতেন।

জগত্তারিণী। রক্ষে করো, আমাকে আর দেখে শুনে কাজ নেই। তোমার রসিকদাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিক। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা মা, যেটুকু বুদ্ধি আছে তার পরিচয় সর্বদাই দিচ্ছি– ও তো চেপে রাখবার জো নেই– ধরা পড়তেই হবে। ভাঙা চাকাটাই সব চেয়ে

খড়্ খড়্ করে– তিনি যে ভাঙা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেইজন্যেই বড়োমা চুপচাপ করে থাকতেই চাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না।

নিজের শৈথিল্যে যাহার কিছুই মনের মতো হয় না, সর্বদা ভর্ৎসনা করিবার জন্য তাহার একটা হতভাগ্যকে চাই। রসিকদাদা জগত্তারিণীর বহিঃস্থিত আত্মগ্লানিবিশেষ।

জগত্তারিণী। আমি তা হলে হারানের বাড়ি চললুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠব– এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরা তো দিনক্ষণ মানিস নে, ঠিক সময়ে ইস্টেশনে যাস।

তাঁহার কন্যাজামাতার অসামান্য আসক্তি মা বেশ অবগত ছিলেন। পঞ্জিকার খাতিরে শেষ মুহূর্তের পূর্বে তাহাদের বিচ্ছেদসংঘটনের চেষ্টা তিনি বৃথা বলিয়াই জানিতেন।

কিন্তু পুরবালা যখন বলিল "মা আমি কাশী যাব না", সেটা তিনি বাড়াবাড়ি মনে করিলেন। পুরবালার প্রতি তাঁহার বড়ো নির্ভর। সে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন। পুরবালা স্বামীর সঙ্গে সিমলা যাতায়াত করিয়া বিদেশ-ভ্রমণে পাকা হইয়াছে; পুরুষ-অভিভাবকের অপেক্ষা পুরবালাকেই তিনি পথসংকটে সহায়রূপে আশ্রয় করিয়াছেন। হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগত্তারিণী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন।

অক্ষয় তাঁহার শাশুড়ির মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "সে কি হয়? তুমি মার সঙ্গে না গেলে ওঁর অসুবিধা হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে স্টেশনে নিয়ে যাব।" জগত্তারিণী নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিকদাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদায়কালীন বিমর্ষতা মুখে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অক্ষয়। কে মশায়! আপনি কে?

"আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে"– বলিয়া পুরুষবেশধারী শৈল অক্ষয়ের সঙ্গে শেক্-হ্যাণ্ড করিল।

শৈল। মুখুজ্যেমশায়, চিনতে তো পারলে না?

পুরবালা। অবাক করলি! লজ্জা করছে না?

শৈল। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ– পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মুখুজ্যেমশায় যদি মেয়ে সাজেন, উনি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। রসিকদাদা, চুপ করে রইলে যে!

রসিক। আহা শৈল! যেন কিশোর কন্দর্প! যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এল! ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আসছি, চোখের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল– ও সুন্দরী কি মাঝারি, কি চলনসই, সে কথা কখনো মনেও ওঠে নি– আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই তো ওর রূপখানি ধরা দিলে! পুরোদিদি, লজ্জার কথা কী বলছিস, আমার ইচ্ছে করছে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করি!

পুরবালা শৈলের তরুণ সুকুমার প্রিয়দর্শন পুরুষমূর্তিতে মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিল। গভীর বেদনার সহিত তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, আহা শৈল আমাদের বোন না হয়ে যদি ভাই হত। ওর এমন রূপ এমন বুদ্ধি ভগবান সমস্তই ব্যর্থ করে দিলেন! পুরবালার স্নিগ্ধ চোখ দুইটি ছলছল করিয়া উঠিল।

অক্ষয় স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীর্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "সত্যি বলছি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোটো ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।"

শৈল ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, "আমিও করতুম না মুখুজ্যেমশায়।"

বাস্তবিক ইহারা দুই ভাইয়ের মতোই ছিল। কেবল সেই ভ্রাতৃভাবের সহিত কৌতুকময় বয়স্যভাব মিশ্রিত হইয়া কোমল সম্বন্ধ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

পুরবালা শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া কহিল, "এই বেশে তুই কুমারসভার সভ্য হতে যাচ্ছিস?"

শৈল। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি! কী বল রসিকদাদা।

রসিক। তা তো বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে তো চলতেই হবে। ভগবান পাণিনি বোপদেব এঁরা কী জন্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কিন্তু ভাই শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপকান-প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়।

অক্ষয়। নতুন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে পড়ে দিতে পারি, চিরকুমার-সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাতু আমি জানি কি না।

পুরবালা একটুখানি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শৈলকে কহিলেন, "তোর মুখুজ্যেমশায়কে আর এই বুড়ো সমবয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর্– আমি মার সঙ্গে কাশী চললুম।"

পুরবালা এই-সকল নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার মনে মনে পছন্দ করিত না। কিন্তু তাহার স্বামীর ও ভগিনীটির বিচিত্র কৌতুকলীলায় সর্বদা বাধা দিতেও তাহার মন সরিত না। নিজের স্বামিসৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বিধবা বোনটির প্রতি তাহার করুণা ও প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না। ভাবিত, হতভাগিনী যেমন করিয়া ভুলিয়া থাকে থাক্। পুরবালা জিনিসপত্র গুছাইতে গেল।

এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। নীর দরজার আড়াল হইতে আর-একবার ভালো করিয়া তাকাইয়া "মেজদিদি" বলিয়া ছুটিয়া আসিল।

কহিল, “মেজদিদি, তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধছে। মনে হচ্ছে তুমি যেন কোন্ রূপকথার রাজপুত্র, তোপান্তর-মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে এসেছ।”

নীরর সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া রহিল। নীর তাহাকে টানিয়া লইয়া কহিল, “অমন করে লোভীর মতো তাকিয়ে আছিস কেন? যা মনে করছিস তা নয়, ও তোর দুষ্যন্ত নয়– ও আমাদের মেজদিদি।”

রসিক।

ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপ্ কানেনাপি তন্বী।

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম॥

অক্ষয়। মুঢ়ে, তোরা কেবল চাপকানটা দেখেই মুগ্ধ! গিল্‌টির এত আদর? এ দিকে যে খাঁটি সোনা দাঁড়িয়ে হাহাকার করছে।

নীরবালা। আজকাল খাঁটি সোনার দর যে বড়ো বেশি, আমাদের এই গিল্‌টিই ভালো! কী বল ভাই মেজদিদি!– বলিয়া শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল।

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোনাটি খুব সস্তায় যাচ্ছে ভাই– এখনো কোনো ট্যাঁকশালে গিয়ে কোনো মহারানীর ছাপটি পর্যন্ত পড়ে নি!

নীরবালা। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান করলুম। (বলিয়া রসিকদাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল) রাজি আছিস তো ভাই?

নৃপবালা। তা আমি রাজি আছি।– বলিয়া রসিকদাদাকে একটা চৌকিতে বসাইয়া সে তাঁহার মাথার পাকা চুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শৈল কহিল, “আঃ, কী করছিস, আমার গোঁফ পড়ে যাবে।”

রসিক। কাজ কী, এ দিকে আয় না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই পড়বে না।

নীরবালা। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কী করতে? আচ্ছা রসিকদাদা, তোমার মাথার দুটো-একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কী করে?

রসিক। কারো কারো মাথা পাকবার আগে মুখটা পাকে।

নীরবালা। দিদিদের সভাটা কোন্ ঘরে বসবে মুখুজ্যেমশায়?

অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে।

নীরবালা। তা হলে সে ঘরটা একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিইগে।

অক্ষয়। যতদিন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করছি, একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি?

নীরবালা। তোমার জন্যে ঝড়ু বেহারা আছে, তবু বুঝি আশা মিটল না?

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। কী হচ্ছে তোমাদের?

নীরবালা। মুখুজ্যেমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা উনি বলছেন, ওঁর বাইরের ঘরটা ভালো করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্ছি। আয় ভাই।

নৃপবালা। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা-না– আমি যাব না।

নীরবালা। বাঃ, আমি একা খেটে মরব আর তুমি সুদ্ধ তার ফল পাবে, সে হবে না।

নৃপকে গ্রেফতার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল।

পুরবালা। সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখনো ট্রেন যাবার দেরি আছে বোধ হয়।

অক্ষয়। যদি মিস করতে চাও তা হলে ঢের দেরি আছে।

পুরবালা। তা হলে চলো, আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। চললুম রসিকদাদা– তুমি এখানে রইলে, এই শিশুগুলিকে একটু সামলে রেখো।

[প্রণাম

রসিক। কিছু ভেবো না দিদি, এরা সকলে আমাকে যেরকম বিপরীত ভয় করে, টুঁশব্দটি করতে পারবে না।

শৈল। দিদিভাই, তুমি একটু থামো। আমি এই কাপড়টা ছেড়ে এসে তোমাকে প্রণাম করছি।

পুরবালা। কেন? ছাড়তে মন গেল যে?

শৈল। না ভাই, এ কাপড়ে নিজেকে আর-একজন বলে মনে হয়, তোদের গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে হয় না! রসিকদাদা, এই নাও, আমার গোঁফটা সাবধানে রেখে দাও, হারিয়ো না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ তাহার বাসায় দক্ষিণের বারান্দায় একখানা বড়োহাতাওআলা কেদারায় দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুক্লসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে টিপায়ের উপর রেকাবিতে একটি গ্লাস বরফ-দেওয়া লেমনেড ও স্তূপাকার কুন্দফুলের মালা।

বিপিন পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "কী গো সন্ন্যাসীঠাকুর।"

শ্রীশ তৎক্ষণাৎ হাতা হইতে পা নামাইয়া উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এখনো বুঝি ঝগড়া ভুলতে পারো নি?"

শ্রীশ কিছুক্ষণ আগেই ভাবিতেছিল, একবার বিপিনের ওখানে যাওয়া যাক। কিন্তু শরৎসন্ধ্যার নির্মল জ্যোৎস্নার দ্বারা আবিষ্ট হইয়া নড়িতে পারিতেছিল না। একটি গ্লাস বরফশীতল লেমনেড ও কুন্দফুলের মালা আনাইয়া জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশে সিগারেটের ধূম-সহযোগে বিচিত্র কল্পনাকুণ্ডলী নির্মাণ করিতেছিল।

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সন্ন্যাসী হতে পারি নে?

বিপিন। কেন পারবে না! কিন্তু অনেকগুলি তল্পিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য এই যে, কেউ-বা আমার বেলফুলের মালা গেঁথে দেবে, কেউ-বা বাজার থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আনবে, এই তো? তাতে ক্ষতিটা কী? যে সন্ন্যাসধর্মে বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উঁচুদরের সন্ন্যাস?

বিপিন। সাধারণ ভাষায় তো সন্ন্যাসধর্ম বলতে সেইরকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ঐ শোনো! তুমি কি মনে কর, ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই? একজনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ, আর-এক জনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থই হয় তা হলে মন বলে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কী করতে?

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কী অর্থ করছেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এইরকম– গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কানে কুণ্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত-আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ-সমস্ত না থাকলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি বুদ্ধি কার্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসীসম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ, একদল কার্তিককে ময়ূরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরোতে হবে।

শ্রীশ। ময়ূর না পাওয়া যায়, ট্রাম আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমারসভা মানেই তো কার্তিকের সভা। কিন্তু কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন? তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটিমাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিন-জোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয়, আমাদের আর্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিনগুণ বেশি বলেই জানতেন। আমিও পালোয়ানিকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানি নে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হল?

শ্রীশ। ঐ দেখো! মানুষকে অহংকার কিরকম মাটি করে! তুমি ঠিক করে রেখেছ, পালোয়ান বললেই তোমাকে বলা হল। তুমি কলিযুগের ভীমসেন! আচ্ছা এসো, যুদ্ধং দেহি! একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক।

এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্য লীলাচ্ছলে হাত কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। বিপিন হঠাৎ "এইবার ভীমসেনের পতন" বলিয়া ধপ্ করিয়া শ্রীশের কেদারাটা অধিকার করিয়া তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল; এবং "উঃ অসহ্য তৃষ্ণা" বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিশ্বাসে খালি করিল। তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি কুন্দফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া "কিন্তু বিজয়মাল্যটি আমার" বলিয়া সেটা মাথায় জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া কহিল, "আচ্ছা ভাই, সত্যি বলো, একদল শিক্ষিত লোক যদি এইরকম সংসার পরিত্যাগ করে পরিপাটি সজ্জায় প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে বেড়ায় তাতে উপকার হয় কি না?"

বিপিন এই তর্কটা লইয়া বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করিল না। কহিল, "আইডিয়াটা ভালো বটে।"

শ্রীশ। অর্থাৎ, শুনতে সুন্দর কিন্তু করতে অসাধ্য! আমি বলছি অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত-দ্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে; তার ছাই ঝেড়ে, তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে, তার জটা মুড়িয়ে, তাকে সৌন্দর্যে এবং কর্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার-সভার একমাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে পড়ানো এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মতো লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি। বলো বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না?

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যেরকম চেহারা গলা এবং আসবাবের প্রয়োজন আমার তো তার কিছুই নেই। তবে তল্পিদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি। কানে যদি সোনার

কুণ্ডল, অন্তত চোখে যদি সোনার চশমাটা পরে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হলে একটা প্রহরীর দরকার– সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চলতে পারবে।

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা!

বিপিন। না ভাই, ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি, তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে তুলতে পার তা হলে খুব ভালোই হয়। তবে এরকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে তো ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্ত্রীজাতির কোনো সংস্রব রাখব না।

বিপিন। মাল্যচন্দন অঙ্গদকুণ্ডল সবই রাখতে চাও, কেবল ঐ একটা বিষয়ে এত বেশি দৃঢ়তা কেন?

শ্রীশ। ঐগুলো রাখছি বলেই দৃঢ়তা। যেজন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে কঠিন শাসনে দূরে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম– অনুরাগ এবং সৌন্দর্যের ধর্ম, সেজন্যেই তার পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়টুকুও আছে!

শ্রীশ। আমার নিজের জন্যে লেশমাত্র নেই। আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনো একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য, কিন্তু তোমরা যে দিনরাত্রি ফুটবল টেনিস ক্রিকেট নিয়ে থাক– তোমরা একবার পড়লে ব্যাটবল গুলিডাণ্ডা সবসুদ্ধ ঘাড়মোড় ভেঙে পড়বে।

বিপিন। আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও কথা ভালো নয়। সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না। সময় তো রথে চড়ে আসেন না, আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি– কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা বলছ তাকে বাহন অভাবে ফিরতেই হবে।

পূর্ণর প্রবেশ

উভয়ে। এসো পূর্ণবাবু!

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। পূর্ণর সহিত শ্রীশ ও বিপিনের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলিয়া তাহাকে দুজনেই একটু বিশেষ খাতির করিয়া চলিত।

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্নাটি তো মন্দ রচনা কর নি– মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভালো।

শ্রীশ। ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব হতেই আমার আছে। কিন্তু দেখো পূর্ণবাবু, ঐ দেশলাই করা-টরা ওগুলো আমার ভালো আসে না।

পূর্ণ। (ফুলের মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে না কি?

শ্রীশ। সেই কথাই তো হচ্ছিল। সন্ন্যাসধর্ম তুমি কাকে বল শুনি।

পূর্ণ। যে ধর্মে দর্জি ধোবা নাপিতের কোনো সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতিকে একেবারেই অগ্রাহ্য করতে হয়, পিয়ার্স্ সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃক্‌পাত করতে হয় না–

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম তো বুড়ো হয়ে মরে গেছে, এখন "নবীন সন্ন্যাসী' বলে একটা সম্প্রদায় গড়তে হবে–

পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন, কিন্তু তিনি তো চিরকুমার-সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চলতেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পারতেন। সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হতে হবে–

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে, এই তো? বিনি-সুতোর মালা গাঁথতে হবে, কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে?

শ্রীশ। স্বদেশের। কথাটা কিছু উচ্চশ্রেণীর হয়ে পড়ল। কী করব বলো, মালিনী মাসি এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ, কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণবাবু–

পূর্ণ। ঠাট্টার মতো মোটেই শোনাচ্ছে না, ভয়ানক কড়া, কথা একেবারে খট্‌খটে শুকনো।

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার-সভা থেকে এমন একটি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি শিক্ষা ও কর্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয় হবে আবার লাঠি-তলোয়ার খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ করায় পারদর্শী হবে–

পূর্ণ। অর্থাৎ, মনোহরণ এবং প্রাণহরণ দুই কর্মেই মজবুত হবে। পুরুষ দেবী-চৌধুরানীর দল আর-কি।

শ্রীশ। বঙ্কিমবাবু আমার আইডিয়াটা পূর্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন, কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতিমশায় কী বলেন?

শ্রীশ। তাঁকে কদিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু তিনি তাঁর দেশালাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন, সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়াবে, এক টাকা করে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক্ খুলে

বড়ো বড়ো পল্লীতে নূতন নিয়মে এক-একটা দোকান বসিয়ে আসবে– ভারতবর্ষের চারি দিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিনবাবুর কী মত?

বিপিনের মতে শ্রীশের এই কল্পনাটি কার্যসাধ্য নয়; কিন্তু শ্রীশের সর্বপ্রকার পাগলামিকে সে স্নেহের চক্ষে দেখিত, প্রতিবাদ করিয়া শ্রীশের উৎসাহে আঘাত দিতে তাহার কোনোমতেই মন সরিত না। সে বলিল, "যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ বলে জ্ঞান করি নে, কিন্তু দল যদি গড়ে ওঠে তো আমিও সন্ন্যাসী সাজতে রাজি আছি।"

পূর্ণ। কিন্তু সাজতে খরচ আছে মশায়। কেবল কৌপীন নয় তো– অঙ্গদ, কুণ্ডল, আভরণ, কুন্তলীন, দেলখোস–

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ঠাট্টাই কর আর যাই কর, চিরকুমার-সভা সন্ন্যাসীসভা হবেই। আমরা এক দিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্য দিকে মনুষ্যত্বের কোনো উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না। আমরা কঠিন শৌর্য এবং ললিত সৌন্দর্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব। সেই দুরূহ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে–

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু! কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়? এবং তাকে উপেক্ষা করলে ললিত সৌন্দর্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে? তার কী উপায় করলে?

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ নরজাতিকে তিনি লতার মতো বেষ্টন করে ধরেন, যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাকত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোনো কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করতে হবে তখন

কাজের সমস্ত বাধা দূর করতে চাই। পাণিগ্রহণ করে ফেললে নিজের পাণিকেও বদ্ধ করে ফেলতে হবে, সে হলে চলবে না পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই, আমি আমার শুভবিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসি নি। কিন্তু ভেবে দেখো দেখি, মনুষ্যজন্ম আর পাব কি না সন্দেহ– অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর কিছু জুটবে কি? মুসলমানের স্বর্গে হুরি আছে, হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই, চিরকুমার-সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমশায়দের চেয়ে মনোরম আর কিছু পাওয়া যাবে কি!

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, বল কী? তুমি যে–

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনো মরিয়া হয়ে উঠি নি। তোমার এই ছাদ-ভরা জ্যোৎস্না আর ঐ ফুলের গন্ধ কি কৌমার্যব্রতরক্ষার সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে? মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়াই ভালো বোধ করি, চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্ দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লারখানা ফেটে যাবে। যাই হোক, যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির কর তো আমিও যোগ দেব, কিন্তু আপাতত সভাটাকে তো রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন? কী হয়েছে?

পূর্ণ। অক্ষয়বাবু আমাদের সভাকে যে স্থানান্তর করবার ব্যবস্থা করছেন এটা আমার ভালো ঠেকছে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিসটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙে যাবে, নষ্ট হবে, এ-সব ভাব আমি কোনো অবস্থাতেই মনে স্থান দিই নে। ভালোই হবে, যা হচ্ছে বেশ হচ্ছে– চিরকুমার-সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি– অক্ষয়বাবু সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার কী অনিষ্ট করতে পারেন?

কেবল গলির এক নম্বর থেকে আর-এক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে পথে দেশে দেশে সঞ্চরণ করে বেড়াতে হবে। সন্দেহ শঙ্কা উদ্‌বেগ এগুলো মন থেকে দূর করে দাও পূর্ণবাবু! বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড়ো কাজ হয় না।

পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন কহিল, "দিনকতক দেখাই যাক-না, যদি কোনো অসুবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে; আমাদের সেই অন্ধকার বিবরটি ফস্‌ করে কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।"

হায়, পূর্ণের হৃদয়বেদনা কে বুঝিবে?

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধববাবুর সবেগে প্রবেশ

তিনজনের সসম্ভ্রমে উত্থান

চন্দ্র। দেখো, আমি সেই কথাটা ভাবছিলুম–

শ্রীশ। বসুন।

চন্দ্র। না না, বসব না, আমি এখনই যাচ্ছি। আমি বলছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটলে, কিম্বা সাধারণ জরজ্বালায়, কিরকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে– ডাক্তার রামরতনবাবু ফি রবিবারে আমাদের দু ঘণ্টা করে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্র। বিলম্ব তো হবেই, কাজটি তো সহজ নয়। কেবল তাই নয়– আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার-অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভুষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসুন–

চন্দ্র। না শ্রীশবাবু, বসতে পারছি নে, আমার একটু কাজ আছে। আর-একটি আমাদের করতে হচ্ছে– গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিসগুলিকে একটু-আধটু সংশোধন করে যাতে কোনো অংশে তাদের সস্তা বা মজবুত বা বেশি উপযোগী করে তুলতে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবারে গরমির ছুটিতে কেদারবাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন–

[চৌকি অগ্রসর-করণ

চন্দ্র। না, না, আমি এখনই যাচ্ছি। দেখো আমার মত এই যে, এই-সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য সামান্য জিনিসগুলির যদি আমরা কোনো উন্নতি করতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যেরকম আন্দোলন হবে, বড়ো বড়ো সংস্কারকার্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকেলে ঢেঁকি-ঘানির কিছু পরিবর্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে–

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু, বসবেন না কি?

চন্দ্র। থাক্ না। একবার ভেবে দেখো, আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আসছি, উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি-কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড়ো বড়ো কলকারখানা তো দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভালো করে চেয়ে দেখলুম, না তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করলুম। যা ছিল তা তেমনিই রয়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হচ্ছে অথচ তার জিনিসপত্র পিছিয়ে থাকছে, এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি– ইংরেজ আমাদের কাঁধে করে বহন করছে, তাকে এগোনো বলে না। ছোটোখাটো সামান্য গ্রাম্য

জীবনযাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বদ্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে, আমাদের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়কে সেই গোরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে– কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক। কটা বাজল শ্রীশবাবু?

শ্রীশ। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্র। তা হলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং–

পূর্ণ। আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু তা হলে আমার দুই-একটা কথা বলবার আছে।–

চন্দ্র। না, আজ আর সময় নেই।

পূর্ণ। বেশি কিছু নয়, আমি বলছিলুম আমাদের সভা–

চন্দ্র। সে কথা কাল হবে পূর্ণবাবু–

পূর্ণ। কিন্তু কালই তো সভা বসছে–

চন্দ্র। আচ্ছা, তা হলে পরশু, আমার সময় নেই–

পূর্ণ। দেখুন, অক্ষয়বাবু যে–

চন্দ্র। পূর্ণবাবু, আমাকে মাপ করতে হবে, আজ দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু দেখো, আমার একটা কথা মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার-সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তা হলে আমাদের সকল সভ্যই কিছু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না– অতএব ওর মধ্যে দুটি বিভাগ রাখা দরকার হবে–

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্র। তা, সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাবু সেদিন একটি কথা যা বললেন সেও আমার মন্দ লাগল না। তিনি বলেন, চিরকুমার-সভার সংস্রবে আর-একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহসংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী

লোকদেরও তো দেশের প্রতি কর্তব্য আছে। সকলেরই সাধ্যমত কোনো-না-কোনো হিতকর কাজে নিযুক্ত থাকতে হবে– এইটে হচ্ছে সাধারণ ব্রত। আমাদের একদল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমারব্রত ধারণ করে এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর-এক দল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য-অনুসারে একটা কোনো প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্যটকসম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে; তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন– তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত হতে পারবে– হন্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না–

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু যদি বসেন তা হলে একটা কথা–

চন্দ্র। না– আমি বলছিলুম– যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রুতি এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে– শিলালিপি, তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান করতে হবে– অতএব প্রাচীন লিপি-পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যক।

পূর্ণ। সে-সব তো পরের কথা, আপাতত–

চন্দ্র। না, না, আমি বলছি নে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোনো কালে শেষ হবে না। অভিরুচি-অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউ-বা একটা কেউ-বা দুটো-তিনটে শিক্ষা করব–

শ্রীশ। কিন্তু তা হলেও–

চন্দ্র। ধরো, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরোতে পারব। যারা চিরজীবনের ব্রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে, যাঁরা টিকে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকবে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্ছে–

চন্দ্র। না পূর্ণবাবু, আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরি কাজ আছে। পূর্ণবাবু, আমার কথাগুলো ভালো করে চিন্তা করে দেখো। আপাতত মনে হতে পারে অসাধ্য– কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য বটে, তা ভালো কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্যে ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু আপনি যে বলছিলেন গোরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতি ছোটো ছোটো জিনিস–

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোটো মনে করে উপেক্ষা করি নে, এবং বড়ো কাজকেও অসাধ্য জ্ঞান করে ভয় করি নে–

পূর্ণ। কিন্তু সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও–

চন্দ্র। সে-সব কথা কাল হবে পূর্ণবাবু! আজ তবে চললুম।

[দ্রুতবেগে প্রস্থান

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে! এক মাতালের মাৎলামি দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সুদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকাবকি করে? কখনো-বা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাবু, হঠাৎ পালাচ্ছ যে?

পূর্ণ। সভাপতিমশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্ছি– পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো-একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উল্‌টো হবে। তাঁর যে কটা কথা বাকি আছে সেইগুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভুলেই যাবেন।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। ভালো আছেন শ্রীশবাবু? বিপিনবাবু ভালো তো? এই-যে পূর্ণবাবুও আছেন দেখছি! তা, বেশ হয়েছে। আমি অনেক বলে কয়ে সেই কুমারটুলির পাত্রীদুটিকে ঠেকিয়ে রেখেছি।

শ্রীশ। কিন্তু আমাদের আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। আমরা একটা গুরুতর কিছু করে ফেলব।

পূর্ণ। আপনারা বসুন শ্রীশবাবু! আমার একটা কাজ আছে।

বিপিন। তার চেয়ে আপনি বসুন পূর্ণবাবু! আপনার কাজটা আমরা দুজনে মিলে সেরে দিয়ে আসছি।

পূর্ণ। তার চেয়ে তিনজনে মিলে সারাই তো ভালো।

বনমালী। আপনারা ব্যস্ত হচ্ছেন দেখছি। আচ্ছা, তা, আর-এক সময় আসব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চন্দ্রমাধববাবু যখন ডাকিলেন– “নির্মল”, তখন একটা উত্তর পাইলেন বটে “কী মামা”, কিন্তু সুরটা ঠিক বাজিল না। চন্দ্রবাবু ছাড়া আর যে-কেহ হইলে বুঝিতে পারিত সে অঞ্চলে অল্প একটুখানি গোল আছে।

“নির্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্ছি নে।”

“বোধ হয় ঐখানেই কোথাও আছে।”

এরূপ অনাবশ্যক এবং অনির্দিষ্ট সংবাদে কাহারো কোনো উপকার নাই, বিশেষত যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ফলত এই সংবাদে অদৃশ্য বোতাম সম্বন্ধে কোনো নূতন জ্ঞানলাভের সহায়তা না করিলেও নির্মলার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা আলোক বর্ষণ করিল। কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্রমাধববাবুর দৃষ্টিশক্তি সে দিকেও যথেষ্ট প্রখর নহে। তিনি অন্য দিনের মতোই নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাবে কহিলেন, “একবার খুঁজে দেখো তো ফেনি।”

নির্মলা কহিল, “তুমি কোথায় কী ফেল আমি কি খুঁজে বের করতে পারি?”

এতক্ষণে চন্দ্রবাবুর স্বভাবনিঃশঙ্ক মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হইল; স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, “তুমিই তো পার নির্মল! আমার সমস্ত ত্রুটিসম্বন্ধে এত ধৈর্য আর কার আছে?”

নির্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল; নিঃশব্দে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু নির্মলার কাছে আসিলেন এবং যেমন করিয়া সন্দিগ্ধ মোহরটি চোখের খুব কাছে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হয় তেমনি করিয়া নির্মলার

মুখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন এবং গম্ভীর মৃদু হাস্যে কহিলেন, "নির্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখছি যেন! কী হয়েছে বলো দেখি।"

নির্মলা জানিত চন্দ্রমাধববাবু অনুমানের চেষ্টাও করিবেন না। যাহা স্পষ্ট প্রকাশমান নহে তাহা তিনি মনের মধ্যে স্থানও দিতেন না। তাঁহার নিজের চিত্ত যেমন শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছ অন্যের নিকটও সেইরূপ একান্ত স্বচ্ছতা প্রত্যাশা করিতেন।

নির্মলা ক্ষুব্ধ স্বরে কহিল, "এত দিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার-সভা থেকে বিদায় দিচ্ছ কেন? আমি কী করেছি?"

চন্দ্রমাধববাবু আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "চিরকুমার-সভা থেকে তোমাকে বিদায়? তোমার সঙ্গে সে সভার যোগ কী?"

নির্মলা। দরজার আড়ালে থাকলে বুঝি যোগ থাকে না? অন্তত সেই যতটুকু যোগ তাই বা কেন যাবে?

চন্দ্রবাবু। নির্মল, তুমি তো এ সভার কাজ করবে না– যারা কাজ করবে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখেই–

নির্মলা। আমি কেন কাজ করব না? তোমার ভাগ্নে না হয়ে ভাগ্নী হয়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্যে যোগ দিতে পারব না? তবে আমাকে এত দিন শিক্ষা দিলে কেন? নিজের হাতে আমার সমস্ত মনপ্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কী বলে?

চন্দ্রমাধববাবু এই উচ্ছ্বাসের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না; তিনি যে নির্মলাকে নিজে কী ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নিজেই জানিতেন না। ধীরে ধীরে কহিলেন, "নির্মল, এক সময়ে তো বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে– চিরকুমার-সভার কাজ–"

"বিবাহ আমি করব না।"

"তবে কী করবে বলো।"

"দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।"

"আমরা তো সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি।"

"ভারতবর্ষে কি কেউ কখনো সন্ন্যাসিনী হয় নি?"

চন্দ্রমাধববাবু স্তম্ভিত হইয়া হারানো বোতামটার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উৎসাহদীপ্তিতে মুখ আরক্তিম করিয়া নির্মলা কহিল, "মামা, যদি কোনো মেয়ে তোমাদের ব্রত গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না? আমি তোমাদের কৌমার্যসভার কেন সভ্য না হব?"

নিষ্কলুষচিত্ত চন্দ্রমাধবের কাছে ইহার কোনো উত্তর ছিল না। তবু দ্বিধাকুণ্ঠিতভাবে বলিতে লাগিলেন, "অন্য যাঁরা সভ্য আছেন–"

নির্মলা কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল, "যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সন্ন্যাসী হতে যাচ্ছেন– তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসংকোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না? তা যদি হয় তা হলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুদ্ধ থাকুন, তাঁদের দ্বারা কোনো কাজ হবে না।"

চন্দ্রমাধববাবু চুলগুলার মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত উস্কোখুস্কো করিয়া তুলিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আস্তিনের ভিতর হইতে হারানো বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল; নির্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধববাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া দিল– চন্দ্রমাধববাবু তাহার কোনো খবর লইলেন না– চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ককুলায়ের চিন্তাগুলিকে বিব্রত করিতে লাগিলেন।

চাকর আসিয়া খবর দিল, পূর্ণবাবু আসিয়াছেন। নির্মলা ঘর হইতে চলিয়া গেলে তিনি প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, "চন্দ্রবাবু, সে কথাটা কি ভেবে দেখলেন? আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভালো হচ্ছে না।"

চন্দ্র। আজ আর-একটি কথা উঠেছে, সেটা পূর্ণবাবু, তোমার সঙ্গে ভালো করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জানো?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী?

চন্দ্র। হাঁ, তাঁর নাম নির্মলা। আমাদের চিরকুমার-সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে।

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কী!

চন্দ্র। আমার বিশ্বাস, তাঁর অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

পূর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শুনলে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে। স্ত্রীলোক হয়ে তিনি–

চন্দ্র। আমিও সেই কথা ভাবছি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে– আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করেছি।

পূর্ণ। (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান করতে পারি।

চন্দ্র। পূর্ণবাবু, তোমারও কি ঐ মত?

পূর্ণ। কী মত বলছেন?

চন্দ্র। অর্থাৎ, যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন?

পূর্ণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ করিয়া উচ্চকণ্ঠে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই, স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর– পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মতো মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। তা তো পারে পূর্ণবাবু, কিন্তু সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্ছে?

পূর্ণ এত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিল যে নবাগত দুইজনে সিঁড়ি হইতেই সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

চন্দ্রবাবু কহিলেন, "না, না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি নে।"

শ্রীশ। গলায় তো একটা বোতাম লাগানো রয়েছে দেখতে পাচ্ছি– আরো কি প্রয়োজন আছে? যদি-বা থাকে, আর ছিদ্র পাবেন কোথা?

চন্দ্রবাবু গলায় হাত দিয়া বলিলেন, "তাই তো!" বলিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

চন্দ্র। আমরা সকলেই তো উপস্থিত আছি, এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভালো, কী বল পূর্ণবাবু?

হঠাৎ পূর্ণবাবুর উৎসাহ অনেকটা নামিয়া গেল। নির্মলার নাম করিয়া সকলের কাছে আলোচনা উত্থাপন তাহার কাছে রুচিকর বোধ হইল না। সে কিছু কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, "সে বেশ কথা, কিন্তু এ দিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?"

চন্দ্র। না, এখনো সময় আছে। শ্রীশবাবু, তোমরা একটু বোসো-না, কথাটা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য। আমার একটি ভাগ্নী আছেন, তাঁর নাম নির্মলা–

পূর্ণ হঠাৎ কাসিয়া লাল হইয়া উঠিল। ভাবিল চন্দ্রবাবুর কাণ্ডজ্ঞানমাত্রই নাই– পৃথিবীর লোকের কাছে নিজের ভাগ্নীর পরিচয় দিবার কী দরকার– অনায়াসে নির্মলাকে বাদ দিয়া কথাটা আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কোনো কথার কোনো অংশ বাদ দিয়া বলা চন্দ্রবাবুর স্বভাব নহে।

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত মনের মিল।

এত বড়ো একটা খবর শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুক ভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ণ কেবলই ভাবিতে লাগিল, নির্মলার প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহারা জড় পাষাণের মতো উদাসীন, নির্মলাকে যাহারা পৃথিবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত পৃথক করিয়া দেখে না, তাহাদের কাছে সে নামের উল্লেখ করা কেন?

চন্দ্র। এ কথা আমি নিশ্চয় বলতে পারি, তাঁর উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে সাড়া না পাইয়া চন্দ্রবাবুও বোধ করি মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন।

চন্দ্র। এ কথা আমি ভালোরূপ বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি, স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্যের মহৎ অবলম্বন। কী বল পূর্ণবাবু!

পূর্ণবাবুর কোনো কথা বলিবার ইচ্ছাই ছিল না; কিন্তু নিস্তেজভাবে বলিল, "তা তো বটেই।"

চন্দ্রবাবুর পালে কোনো দিক হইতে কোনো হাওয়া লাগিল না দেখিয়া হঠাৎ সবেগে ঝিঁকা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নির্মলা যদি কুমারসভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে তা হলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন?"

পূর্ণ তো একেবারে বজ্রাহতবৎ! বলিয়া উঠিল, "বলেন কী চন্দ্রবাবু?"

শ্রীশ পূর্ণর মতো অত্যুগ্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া কহিল, "আমরা কখনো কল্পনা করি নি যে, কোনো স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিয়ম নেই–"

ন্যায়পরায়ণ বিপিন গম্ভীরকণ্ঠে কহিল, "নিষেধও নেই।"

অসহিষ্ণু শ্রীশ কহিল, "স্পষ্ট নিষেধ না থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সভার যে-সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয়।"

কুমারসভায় স্ত্রীলোক সভ্য লইবার জন্য বিপিনের যে বিশেষ উৎসাহ ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার মানসপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংযম থাকায় কোনো শ্রেণী-বিশেষের বিরুদ্ধে এক-দিক-ঘেঁষা কথা সে সহিতে পারিত না। তাই সে বলিয়া উঠিল, "আমাদের সভার উদ্দেশ্য সংকীর্ণ নয়, এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যেরকম পারবেন তুমি সেরকম পারবে না এবং তুমি যেরকম পারবে একজন স্ত্রীলোক সেরকম পারবেন না– অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও যেমন দরকার স্ত্রীসভ্যেরও তেমনি দরকার।"

লেশমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া বিপিন শান্তগম্ভীরভাবে বলিয়া গেল– কিন্তু শ্রীশ কিছু উত্তপ্ত হইয়া বলিল, "যারা কাজ করতে চায় না তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষকে সীমাবদ্ধ করতে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ আমি তত বৃহৎ মনে করি নে।"

বিপিন শান্তমুখে কহিল, "আমাদের সভার কার্যক্ষেত্র অন্তত এতটা বৃহৎ যে, তোমাকে গ্রহণ করেছে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেছে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। তোমার-আমার উভয়েরই যদি এ স্থানে স্থান হয়ে

থাকে, আমাদের দুজনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা থাকে, তা হলে আরো একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কী কঠিন?”

শ্রীশ চটিয়া কহিল, “উদারতা অতি উত্তম জিনিস, সে আমি নীতিশাস্ত্রে পড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট করতে চাই নে, বিভক্ত করতে চাই মাত্র। স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করতে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না, এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্। নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মরুক, উদরটা পরিপাক করতে থাক্– পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশচেষ্টা না করলেই বস্।”

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিন্ন করে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর-এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না।

শ্রীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, “উপমা তো আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হল। উপমা কেবল খানিক দূর পর্যন্ত খাটে”–

বিপিন। অর্থাৎ যতটুকু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

এই দুই পরম বন্ধুর মধ্যে এমন বিবাদ সর্বদাই ঘটিয়া থাকে। পূর্ণ অত্যন্ত বিমনা হইয়া বসিয়াছিল; সে কহিল, “বিপিনবাবু, আমার মত এই যে, আমাদের এই-সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মাধুর্য নষ্ট হয়।”

চন্দ্রবাবু একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া কহিলেন, “মহৎ কার্যে যে মাধুর্য নষ্ট হয় সে মাধুর্য সযত্নে রক্ষা করবার যোগ্য নয়।”

শ্রীশ বলিয়া উঠিল, “না চন্দ্রবাবু, আমি ও-সব সৌন্দর্য-মাধুর্যের কথা আনছিই নে। সৈন্যদের মতো এক চালে আমাদের চলতে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দুর্বলতাবশত

যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে।"

এমন সময় নির্মলা অকুণ্ঠিত মর্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। যদিচ একটা অশ্রুপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র ছিল তথাপি সে দৃঢ় স্বরে কহিল, "আপনাদের কী উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাজে কতদূর পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানি নে– কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি, তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্ছেন?"

শ্রীশ নিরুত্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত গম্ভীর, চন্দ্রবাবু সুগভীর চিন্তামগ্ন।

পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি বর্ষার রৌদ্ররশ্মির ন্যায় অশ্রুজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া নির্মলা কহিল, "আমি যদি কাজ করতে চাই– যিনি আমার আশৈশবের গুরু, মৃত্যু পর্যন্ত যদি সকল শুভচেষ্টায় তাঁর অনুবর্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন? আপনারা আমাকে কী জানেন!"

শ্রীশ স্তব্ধ। পূর্ণ ঘর্মাক্ত।

নির্মলা। আমি আপনাদের কুমারসভা বা অন্য কোনো সভা জানি নে, কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি তিনি যখন কুমারসভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমারসভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই তা হলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এঁরা আমাকে কী জানেন। এঁরা কেন আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে তর্ক করছেন?

শ্রীশ তখন বিনীত মৃদুস্বরে কহিল, "মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোনো তর্ক করি নি, আমি সাধারণত স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে বলছিলুম–"

নির্মলা। আমি স্ত্রীজাতি-পুরুষজাতির প্রভেদ নিয়ে কোনো বিচার করতে চাই নে– আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশি আমার আর-কিছু জানবার দরকার নেই।

চন্দ্রবাবু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোনো কথাই বাহির হইল না। নির্মলা দ্বারের অন্তরালে থাকিলে পূর্ণর বাক্‌শক্তি যেরূপ সতেজ থাকে আজ তাহার তেমন পরিচয় পাওয়া গেল না।

তবু সে মনে মনে অনেক আবৃত্তি করিয়া বলিল, "দেবী, এই পঙ্কিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করিতে চাচ্ছেন?"

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না– পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা গদ্যের মধ্যে হঠাৎ পদ্যের মতো কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল। লজ্জায় তাহার কান লাল হইয়া উঠিল। বিপিন স্বাভাবিক সুগম্ভীর শান্তস্বরে কহিল, "পৃথিবী যত বেশি পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধন-কার্য তত বেশি পবিত্র।"

এই কথাটায় কৃতজ্ঞ নির্মলার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া পূর্ণ ভাবিল, "আহা, কথাটা আমারই বলা উচিত ছিল।' বিপিন বলিয়াছে বলিয়া তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল।

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে নিয়মমত প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্মলা এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করিয়া পালের নৌকার মতো নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হঠাৎ অধ্যাপক সচেতন হইয়া ডাকিলেন, “ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা?”

নির্মলা সলজ্জ হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে ইশারা করিয়া কহিল, “গলাতেই আছে।”

চন্দ্রবাবু গলায় হাত দিয়া “হাঁ হাঁ আছে বটে” বলিয়া তিন ছাত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নৃপবালা। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গম্ভীর হচ্ছিস বল্‌ তো নীরু।

নীরবালা। আমাদের বাড়ির যত কিছু গাম্ভীর্য সব বুঝি তোর একলার? আমার খুশি আমি গম্ভীর হব।

নৃপবালা। তুই কী ভাবছিস আমি বেশ জানি।

নীরবালা। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কী ভাই? এখন তোর নিজের ভাবনা ভাববার সময় হয়েছে।

নৃপ নীরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "তুই ভাবছিস, মা গো মা, আমরা কী জঞ্জাল। আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা, এত ঝঞ্ঝাট।"

নীরবালা। তা, আমরা তো ভাই ফেলে দেবার জিনিস নয় যে অমনি ছেড়ে দিলেই হল। আমাদের জন্যে যে এতটা হাঙ্গাম হচ্ছে সে তো গৌরবের কথা। কুমারসম্ভবে তো পড়েছিস গৌরীর বিয়ের জন্য একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। যদি কোনো কবির কানে উঠে তা হলে আমাদের বিবাহেরও একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

নৃপবালা। না ভাই, আমার ভারি লজ্জা করছে।

নীরবালা। আর, আমার বুঝি লজ্জা করছে না? আমি বুঝি বেহায়া? কিন্তু কী করবি বল্‌? ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা করেছিল, আবার তার পর বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলেম। লজ্জাও করে প্রাইজও ছাড়ি নে, আমার এই স্বভাব।

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, এবারে যে প্রাইজটার কথা চলছে সেটার জন্য তুই কি খুব ব্যস্ত হয়েছিস?

নীরবালা। কোন্‌টা বল্‌ দেখি। চিরকুমার-সভার দুটো সভ্য?

নৃপবালা। যেই হোক-না কেন, তুই তো বুঝতে পারছিস।

নীরবালা। তা ভাই, সত্যি কথা বলব? (নৃপর গলা জড়াইয়া কানে কানে) শুনেছি কুমারসভার দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দুজনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না– নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই। তাই তো সেই যুগল দেবতার জন্যে এত পুজোর আয়োজন করেছি ভাই! জোড়হস্তে মনে মনে বলছি, হে কুমারসভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি বোনকে এক বোঁটার দুটি ফুলের মতো তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ করো।

বিরহসম্ভাবনার উল্লেখমাত্রে দুটি ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল এবং নৃপ কোনোমতে চোখের জল সামলাইতে পারিল না।

নৃপবালা। আচ্ছা নীরু, মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্‌ দেখি। আমরা দুজনে গেলে ওঁর আর কে থাকবে?

নীরবালা। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাকতে যদি দেন তা হলে কি ছেড়ে যাই? ভাই, ওঁর তো স্বামী নেই, আমাদেরও নাহয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশি সুখে আমাদের দরকার কী?

পুরুষবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ

নীরু টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইল। শৈলবালার গলায় পরাইয়া কহিল, “আমরা দুই স্বয়ম্বরা তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করলুম।”

এই বলিয়া শৈলবালাকে প্রণাম করিল।

শৈল। ও আবার কী?

নীরবালা। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতীনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি, সেজদিদি আমার সঙ্গে পারবে না– আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। না, সত্যি বলছি মেজদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি কোথাও পাব? কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস?

পুনর্বার নৃপর দুই চক্ষু বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। "ও কী ও নৃপ, ছি" বলিয়া শৈল তাহার চোখ মুছিয়া দিল; কহিল, "তোদের কিসে সুখ তা কি তোরা জানিস? আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর কারো হাতে তোদের দিতে পারতুম?"

তিনজনে মিলিয়া একটা অশ্রুবর্ষণকাণ্ড ঘটিবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময়ে রসিকদাদা প্রবেশ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "ভাই, আমার মতো অসভ্যটাকে তোরা সভ্য করলি– আজ তো সভা এখানে বসবে, কিরকম ভাবে চলব শিখিয়ে দে!"

নীর কহিল, "ফের পুরোনো ঠাট্টা?– তোমার ঐ সভ্য-অসভ্যর কথাটা এই পরশু থেকে বলছ।"

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না? ঠাট্টা একবার মুখ থেকে বের হলেই কি রাজপুতের কন্যার মতো তাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে হবে? হয়েছে কী– যতদিন চিরকুমার-সভা টিকে থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দু-বেলা শুনতে হবে।

নীরবালা। তবে ওটাকে তো একটু সকাল সকাল সেরে ফেলতে হচ্ছে। মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়– রসিকদাদার রসিকতাকে পুরোনো হতে দেব না, চিরকুমার-সভার

চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব তবেই তো আমাদের বিশ্ববিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে। কিরকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছু প্ল্যান ঠাউরেছিস?

শৈল। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যেরকম মাথায় আসে।

নীরবালা। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরী ধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব। "আমি কি ডরাই সখী কুমারসভারে? নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে?'

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "অদ্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।"

শৈল। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বলো দেখি যে-দুটি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ডাল কাটতে চেয়েছিলেন কে?

নৃপ তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, "আমি জানি মুখুজ্যেমশায়, কালিদাস।"

অক্ষয়। না, আরো একজন বড়ো লোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

নীরবালা। ডাল দুটি কে?

অক্ষয় বামে নীরুকে টানিয়া বলিলেন "এই একটি" এবং দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন "এই আর-একটি।"

নীরবালা। আর কুড়ুল বুঝি আজ আসছে?

অক্ষয়। আসছে কেন, এসেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ-যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

শুনিয়া দৌড়, দৌড়। শৈল পালাইবার সময় রসিকদাদাকে টানিয়া লইয়া গেল। চুড়ি-বালার ঝংকার এবং ত্রস্ত পদপল্লব কয়েকটির দ্রুতপতনশব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ দূর হইতে দূরে বাজিতে লাগিল। এবং ঘরের আলোড়িত বাতাসে এসেন্স্ ও গন্ধতৈলের মিশ্রিত মৃদু পরিমল যেন পরিত্যক্ত

আসবাবগুলির মধ্যে আপনার পুরাতন আশ্রয়গুলিকে খুঁজিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে শক্তির অপচয় নাই, রূপান্তর আছে। স্বর হইতে হঠাৎ তিন ভগিনীর পলায়নের বাতাসে যে একটি সুগন্ধ আন্দোলন উঠিয়াছিল সেটা কি প্রথমে কুমারযুগলের বিচিত্র স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটি নিগূঢ় স্পন্দন ও অব্যবহিত পরেই তাঁহাদের অন্তঃকরণের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য একটি অনির্বচনীয় পুলকে পরিণত হয় নাই? কিন্তু সংসারের যেখান হইতে ইতিহাস শুরু হয় তাহার অনেক পরের অধ্যায় হইতে লিখিত হইয়া থাকে– প্রথম স্পর্শ স্পন্দন আন্দোলন ও বিদ্যুৎচমকগুলি প্রকাশের অতীত।

পরস্পর নমস্কারের পর অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "পূর্ণবাবু এলেন না যে?"

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে আজ আর আসতে পারলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন– আমি চন্দ্রবাবুর অপেক্ষায় দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধ মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই– কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমারসভার অধিবেশন কোনোমতেই প্রার্থনীয় নয়। বলিয়া অক্ষয় নামিয়া গেলেন।

আজ চন্দ্রবাবুর বাসায় হঠাৎ নির্মলা আবির্‌ভূত হইয়া চিরকুমারদলের শান্ত মনের মধ্যে যে একটা মন্থন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিল তাহার অভিঘাত বোধ করি এখনো শ্রীশের মাথায় চলিতেছিল। দৃশ্যটি অপূর্ব, ব্যাপারটি অভাবনীয়, এবং নির্মলার কমনীয় মুখে যে-একটি দীপ্তি ও তাহার কথাগুলির মধ্যে যে-একটি আন্তরিক আবেগ ছিল তাহাতে তাহাকে বিস্মিত ও তাহার চিন্তার স্বাভাবিক গতিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। সে লেশমাত্র

প্রস্তুত ছিল না বলিয়া এই আকস্মিক আঘাতেই বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। তর্কের মাঝখানে হঠাৎ এমন জায়গা হইতে এমন করিয়া এমন একটা উত্তর আসিয়া উপস্থিত হইবে স্বপ্নেও মনে করে নাই বলিয়াই উত্তরটা তাহার কাছে এমন প্রবল হইয়া উঠিল। উত্তরের প্রত্যুত্তর থাকিতে পারে, কিন্তু সেই আবেগকম্পিত ললিতকণ্ঠে– সেই গূঢ়-অশ্রু-করুণ বিশাল কৃষ্ণচক্ষুর দীপ্তিচ্ছটার প্রত্যুত্তর কোথায়? পুরুষের মাথায় ভালো ভালো যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যে আরক্ত অধর কথা বলিতে গিয়া স্ফুরিত হইতে থাকে, যে কোমল কপোল দুটি দেখিতে দেখিতে ভাবের আভাসে করুণাভ হইয়া উঠে, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে পারে পুরুষের হাতে এমন কী আছে?

পথে আসিতে আসিতে দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো কথাই হয় নাই। এখানে আসিয়া ঘরে প্রবেশ না করিতেই যে শব্দগুলি শোনা গেল, অন্য কোনো দিন হইলে শ্রীশ তাহা লক্ষ্য করিত কি না সন্দেহ– আজ তাহার কাছে কিছুই এড়াইল না। অনতিপূর্বেই ঘরের মধ্যে রমণীদল যে ছিল, ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহা বুঝিতে পারিল।

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইল। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো। সেটা চকিতে তাহাকে একটু যেন বিচলিত করিল। তাহার একটা কারণ শ্রীশ অত্যন্ত ফুল ভালোবাসে, তাহার আর-একটা কারণ শ্রীশ কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইল– অনতিকাল পূর্বেই যাহাদের সুনিপুণ দক্ষিণ হস্ত এই ফুলগুলি সাজাইয়াছে তাহারাই এখনই ত্রস্তপদে ঘর হইতে পলাইয়া গেল।

বিপিন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার-সভার উপযুক্ত নয়।"

হঠাৎ মৌনভঙ্গে শ্রীশ চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, "কেন নয়?"

বিপিন কহিল, "ঘরের সজ্জাগুলি তোমার নবীন সন্ন্যাসীদের পক্ষেও যেন বেশি বোধ হচ্ছে।"

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্মের পক্ষে বেশি কিছুই হতে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া!

শ্রীশ কহিল, "হাঁ, ঐ একটি মাত্র!"– লেখকের অনুমানমাত্র হইতে পারে, কিন্তু অন্যদিনের মতো কথাটায় তেমন জোর পৌঁছিল না।

বিপিন কহিল, "দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচরকমে এ ঘরটিতে সেই নারীজাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।"

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় তো সর্বত্রই আছে।

বিপিন। তা তো বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তা হলে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোনোখানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষমানুষের নিষ্কৃতি পাবার জো নেই।

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, "কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্রবাবুর বাসার সেই একতলার ঘরটিতে রমণীর কোনো সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।"

বিপিন। বেচারা চিরকুমার কটির জন্যে একটা কোণও ফাঁকা রাখে নি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ "এই দেখো-না" বলিয়া কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল।

বিপিন কাঁটা দুটি লইয়া পর্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, "ওহে ভাই, এ স্থানটা তো কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।"

শ্রীশ। ফুলও আছে, কাঁটাও আছে।

বিপিন। সেইটেই তো বিপদ। কেবল কাঁটা থাকলে এড়িয়ে চলা যায়।

শ্রীশ অপর কোণের ছোটো বইয়ের শেল্‌ফ হইতে বইগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতকগুলি নভেল, কতকগুলি ইংরাজি কাব্যসংগ্রহ। প্যাল্‌গ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দেখিল, মার্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা– তখন গোড়ার পাতাটা উল্‌টাইয়া দেখিল। দেখিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল।

বিপিন পড়িয়া কহিল, "নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষমানুষের নয়। কী বোধ কর।"

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্যজাতীয়ের বলে ঠেকছে হে!

বলিয়া আর-একটা বই দেখাইল।

বিপিন কহিল, "নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমারসভায়–"

শ্রীশ। কুমারসভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি এত বড়ো বলবান তো আমাদের মধ্যে কাউকে দেখি নে।

বিপিন। পূর্ণ তো একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল– রক্ষা পায় কি না সন্দেহ।

শ্রীশ। কিরকম?

বিপিন। লক্ষ্য করে দেখ নি বুঝি?

প্রশান্তস্বভাব বিপিনকে দেখিলে মনে হয় না যে, সে কিছু দেখে; কিন্তু তাহার চোখে কিছুই এড়ায় না। পরম দুর্বল অবস্থায় পূর্ণকে সে দেখিয়া লইয়াছে।

শ্রীশ। না না, ও তোমার অনুমান।

বিপিন। হৃদয়টা তো অনুমানেরই জিনিস– না যায় দেখা, না যায় ধরা।

শ্রীশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল; কহিল, "পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়?"

বিপিন। না, এ-সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোনো লেক্‌চার চলে না।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

শ্রীশ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল, গম্ভীর বিপিন স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

চন্দ্রবাবু প্রবেশ করিয়া কহিলেন, "আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ করলুম।"

শ্রীশ বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিল; বিপিন গম্ভীরমুখে কহিল, "পূর্ণবাবুর যেরকম দুর্বল অবস্থা দেখছি পূর্ব হতেই তাঁর বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল।"

চন্দ্রমাধব সরলভাবে উত্তর করিলেন, "পূর্ণবাবুকে তো বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না।"

চন্দ্রমাধববাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পূর্বেই অক্ষয় রসিকদাদাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, "মাপ করবেন, এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি চলে যাচ্ছি।"

রসিক হাসিয়া কহিলেন, "আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়–"

অক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশত সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেছেন, ক্রমশ পরিচয় পাবেন। ইনি হচ্ছেন সার্থকনামা শ্রীরসিক চক্রবর্তী।

শুনিয়া শ্রীশ ও বিপিন সহাস্যে রসিকের মুখের দিকে চাহিল; রসিকদাদা কহিলেন, "পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্য পালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা করতে হয়, তার পরে "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ'।"

অক্ষয় প্রস্থান করিলেন। ঘরে দুটি কেরোসিনের দীপ জ্বলিতেছে; সেই দুটিকে বেষ্টন করিয়া ফিরোজ রঙের রেশমের অবগুণ্ঠন। সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি মৃদু এবং রঙিন হইয়া উঠিয়াছে।

পুরুষবেশী শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল। ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধববাবু ঝাপসাভাবে তাহাকে দেখিলেন– বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

শৈলের পশ্চাতে দুইজন ভৃত্য কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। শৈল ছোটো ছোটো রুপার থালাগুলি লইয়া সাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল। প্রথম পরিচয়ের দুর্নিবার লজ্জাটুকু সে এইরূপ আতিথ্যব্যাপারের মধ্যে ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

রসিক কহিলেন, “ইনি আপনাদের সভার আর একটি নবীন সভ্য। এঁর নবীনতা সম্বন্ধে কোনো তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বুদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেছেন। আপনারা কিছু বিস্মিত হয়েছেন দেখছি– হবার কথা। এঁকে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম– ইনি বালক নন।”

চন্দ্র। এঁর নাম?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ বলিয়া উঠিল, “অবলাকান্ত?”

রসিক। নামটি আমাদের সভার উপযোগী নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই– যদি পরিবর্তন করে বিক্রমসিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোনো উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে “স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ’, কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতে পৌরুষ অর্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ কহিল, “বলেন কী মশায়! নাম তো আর গায়ের বস্ত্র নয়, যে বদল করলেই হল।”

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশবাবু। নামটাকে প্রাচীনেরা পোশাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন-না কেন, অর্জুনের পিতৃদত্ত নাম কী ঠিক করে বলা শক্ত– পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আসত তাই বলেই ডাকত। দেখুন

নামটাকে আপনারা বেশি সত্য মনে করবেন না; ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত না'ও বলেন উনি লাইবেলের মোকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, "আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্ছেন তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম, কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না– নাম ভুল করব না মশায়।"

রসিক। আপনি না করতে পারেন, কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন– সেইজন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক বলতে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ উঠিয়া কহিল, "অবলাকান্তবাবু, আপনি এ-সমস্ত কী আয়োজন করেছেন? আমাদের সভার কার্যাবলীর মধ্যে মিষ্টান্নটা ছিল না।"

রসিক। (উঠিয়া) সেই ত্রুটি যিনি সংশোধন করছেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শ্রীশের মুখের দিকে না চাহিয়া থালা সাজাইতে সাজাইতে শৈল কহিল, "শ্রীশবাবু, আহারটাও কী আপনাদের নিয়মবিরুদ্ধ?"

শ্রীশ দেখিল কণ্ঠস্বরটিও অবলা নামের উপযুক্ত। কহিল, "এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোনো সংশয় থাকবে না।"

বলিয়া বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিল।

বিপিন কহিল, "নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্তবাবু, সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিসমাত্রই নিজের নিয়ম নিজে সৃষ্টি করে। ক্ষমতাশালী লেখক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টান্নগুলি সংগ্রহ করেছেন এর সম্বন্ধেও কোনো সভার নিয়ম খাটতে পারে না– এর একমাত্র নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা। ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।"

শ্রীশ কহিল, "তোমার হল কী বিপিন? তোমাকে খেতে দেখেছি বটে, কিন্তু এক নিশ্বাসে এত কথা কইতে শুনি নি তো।"

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরল বাক্য বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখবেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায়?

রসিক টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি অত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।"

নূতন ঘরের বিলাসসজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধববাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহস্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্যবিবরণের খাতা, ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠী অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। শৈল তাঁহার সম্মুখে গিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, "সভার কার্যের যদি কিছু ব্যাঘাত করে থাকি তো মাপ করবেন, চন্দ্রবাবু, কিছু জলযোগ–"

চন্দ্রবাবু শৈলকে নিকটে পাইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "এ-সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নেই।"

রসিক কহিলেন, "আচ্ছা, পরীক্ষা করে দেখুন মিষ্টান্নে যদি সভার কার্য রোধ হয় তা হলে–"

বিপিন মৃদুস্বরে কহিল, "তা হলে ভবিষ্যতে না হয় সভাটা বন্ধ রেখে মিষ্টান্নটা চালালেই হবে।"

চন্দ্রবাবু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে শৈলের সুন্দর সুকুমার চেহারাটি কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তখন শৈলকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না।

বলা আবশ্যক, অচিরকাল পূর্বেই বিপিন জলযোগ করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাহার ভোজনের ইচ্ছামাত্র ছিল না, কিন্তু এই প্রিয়দর্শন কুমারটিকে দেখিয়া, বিশেষত তাহার মুখের অত্যন্ত কোমল একটি স্মিতহাস্যে, বিপুলবলশালী বিপিনের চিত্ত হঠাৎ এমনি স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, অস্বাভাবিক মুখরতার সহিত মিষ্টান্নের প্রতি সে অতিরিক্ত লোলুপতা প্রকাশ করিল। রোগভীরু শ্রীশের অসময়ে খাইবার সাহস ছিল না, তাহারও মনে হইল, না খাইতে বসিলে এই তরুণ কুমারটির প্রতি কঠিন রূঢ়তা করা হইবে।

শ্রীশ কহিল, “আসুন রসিকবাবু, আপনি উঠছেন না যে।”

রসিক। রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার-সভার সভ্যরূপে আপনাদের সংসর্গগৌরবে কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু–

শৈল। কিন্তু আবার কী রসিকদাদা? তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি?

রসিক। দেখেছেন মশায়! নিয়ম আর কারো বেলায় না, কেবল রসিকদাদার বেলায়! নাঃ– বলং বলং বাহুবলম্! উপরোধ-অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়।

বিপিন। (চারটিমাত্র ভোজনপাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বসবেন না!

শৈল। না, আমি আপনাদের পরিবেশন করব।

শ্রীশ উঠিয়া কহিল, “সে কি হয়!”

শৈল কহিল, “আমার জন্যে আপনারা অনেক অনিয়ম সহ্য করেছেন, এখন আমার আর একটিমাত্র ইচ্ছা পূর্ণ করুন। আমাকে পরিবেশন করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশি খুশি হব।”

শ্রীশ। রসিকবাবু, এটা কি ঠিক হচ্ছে?

রসিক। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। উনি পরিবেশন করতে ভালোবাসেন, আমরা আহার করতে ভালোবাসি। এরকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে।

আহার আরম্ভ হইল।

শৈল। চন্দ্রবাবু, ওটা মিষ্টি, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারি আছে। জলের গ্লাস খুঁজছেন? এই-যে গ্লাস।– বলিয়া গ্লাস অগ্রসর করিয়া দিল।

চন্দ্রবাবুর নির্মলাকে মনে পড়িল। মনে হইল এই বালকটি যেন নির্মলার ভাই। আত্মসেবায় অনিপুণ চন্দ্রবাবুর প্রতি শৈলের একটু বিশেষ স্নেহোদ্রেক হইল। চন্দ্রবাবুর পাতে আম ছিল, তিনি সেটাকে ভালোরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না– অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময়ে যেটি আবশ্যক সেটি আস্তে আস্তে হাতের কাছে জোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজন-ব্যাপারটি নির্বিঘ্ন করিতে লাগিল।

চন্দ্র। শ্রীশবাবু, স্ত্রী-সভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা করেছেন?

শ্রীশ। ভেবে দেখতে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিনের তর্কপ্রবৃত্তি চড়িয়া উঠিল। কহিল, "সমাজকে অনেক সময় শিশুর মতো গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চললে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।"

আজ শ্রীশ উপস্থিত প্রস্তাবটা সম্বন্ধে অনেকটা নরমভাবে ছিল, নতুবা উত্তাপ হইতে বাষ্প ও বাষ্প হইতে বৃষ্টির মতো এই তর্ক হইতে কলহ ও কলহ হইতে পুনর্বার সদ্ভাবের সৃষ্টি হইত।

এমন-কি, শ্রীশ কথঞ্চিৎ উৎসাহের সহিত বলিল, "আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতি আয়োজন-অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে-সকল কার্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিকবাবু কী বলেন?"

রসিক। অবস্থাগতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবু এটুকু জেনেছি, স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্য সুবিধা যদি-বা নাও হয় তবু বাধার হাত এড়ানো যায়। বিবেচনা করে দেখুন, চিরকুমার-সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তা হলে গোপনে এই সভাটিকে নষ্ট করবার জন্যে ওঁদের উৎসাহ থাকত না, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়–

শৈল। কুমারসভার উপর স্ত্রীজাতির আক্রোশের খবর রসিকদাদা কোথায় পেলে?

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই? একচক্ষু হরিণ যে দিকে কানা ছিল সেই দিক থেকেই তো তীর খেয়েছিল। কুমারসভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কানা হন তা হলে সে দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদুস্বরে) একচক্ষু হরিণ তো আজ একটা তীর খেয়েছেন, একটি সভ্য ধূলিশায়ী।

চন্দ্র। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভালো করতে চায় তারা এক পায়ে চলতে চায়। সেইজন্যেই খানিক দূর গিয়েই তাদের বসে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে না। আমাদের হৃদয়, আমাদের কাজ, আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। সেইজন্যে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই, ঘরে এসে ভুলি। দেখো অবলাকান্তবাবু, এখনো তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভালো করে মনে রেখো– স্ত্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নিচু করে রাখি তা হলে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ

করেন; তা হলে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়, দু পা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি তা হলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব করতে লজ্জা বোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।

শৈল চন্দ্রবাবুর এই কথাগুলি আনতমস্তকে শুনিল; কহিল, "আশীর্বাদ করুন আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত করতে পারি।"

একান্ত নিষ্ঠার সহিত উচ্চারিত এই কথাগুলি শুনিয়া চন্দ্রবাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সকল উপদেশের প্রতি নির্মলার তর্কবিহীন বিনম্র শ্রদ্ধার কথা মনে পড়িল। স্নেহার্দ্র মনে আবার ভাবিলেন, এ যেন নির্মলারই ভাই।

চন্দ্র। আমার ভাগ্নী নির্মলাকে কুমারসভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে আপনাদের কোনো আপত্তি নেই?

রসিক। আর কোনো আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমারসভায় কেউ যদি কুমারীবেশে আসেন তা হলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈল। বোপদেবের অভিশাপ একালে খাটে না।

রসিক। আচ্ছা, অন্তত লোহারামকে তো বাঁচিয়ে চলতে হবে। আমি তো বোধ করি, স্ত্রীসভ্যরা যদি পুরুষসভ্যদের অজ্ঞাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্তন করে আসেন তা হলে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তা হলে একটা কৌতুক এই হয় যে, কে স্ত্রী কে পুরুষ নিজেদের এই সন্দেহটা থেকে যায়–

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার নাতনী বলে কারো হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়।

তখন শৈল অদূরবর্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল।

চন্দ্র। দেখুন রসিকবাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। স্ত্রীসভ্য গ্রহণ করলে চিরকুমার-সভার অর্থের যদি পরিবর্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কী?

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্তনের বিরোধী নই– তা নাম-পরিবর্তন বা বেশ-পরিবর্তন বা অর্থ-পরিবর্তন যাই হোক-না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি হইল না।

আহার-অবসানে রসিক কহিল, "আশা করি সভার কাজের কোনো ব্যাঘাত হয় নি।"

শ্রীশ কহিল, "কিছু না– অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চলত, আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে।"

বিপিন। তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশি হয়েছে।

শুনিয়া শৈল খুশি হইয়া তাহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধকোমল হাস্যে সকলকে পুরস্কৃত করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

অক্ষয়। হল কী বল দেখি! আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড়ু বেহারার ঝাড়নের তাড়নে নির্মল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দু-বেলা তোমাদের দুই বোনের অঞ্চলবীজনে চঞ্চল হয়ে উঠছে যে!

নীরবালা। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ বলে দয়া করে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তার উপরে আবার জবাবদিহি?

অক্ষয়।

গান। ভৈরবী

ওগো দয়াময়ী চোর, এত দয়া মনে তোর!
বড়ো দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর!
বড়ো দয়া করে চুরি করে লও শূন্য হৃদয় মোর!

নীরবালা। মশায়, এখন সিঁধ কাটার পরিশ্রম মিথ্যে; আমাদের এমন বোকা চোর পাও নি! এখন হৃদয় আছে কোথায় যে চুরি করতে আসব?

অক্ষয়। ঠিক করে বলো দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কতদূরে?

নৃপবালা। আমি জানি মুখুজ্যেমশায়। বলব? চারশো পঁচাত্তর মাইল।

নীরবালা। সেজদিদি অবাক করলে! তুই কি মুখুজ্যেমশায়ের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছুটেছিলি নাকি?

নৃপবালা। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইম্‌টেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়।

গান। বাহার

চলেছে ছুটিয়া পলাতকা হিয়া,
বেগে বহে শিরা ধমনী–
হায় হায় হায়, ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমণী।
বায়ুবেগভরে উড়ে অঞ্চল,
লটপট বেণী দুলে চঞ্চল–
এ কী রে রঙ্গ, আকুল-অঙ্গ
ছুটে কুরঙ্গগমনী!

নীরবালা। কবিবর, সাধু সাধু। কিন্তু তোমার রচনায় কোনো কোনো আধুনিক কবির ছায়া দেখতে পাই যেন!

অক্ষয়। তার কারণ আমিও অত্যন্ত আধুনিক! তোরা কি ভাবিস তোদের মুখুজ্যেমশায় কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুনে দিচ্ছিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল? তা হলে আর বিদুষী শ্যালী থেকে ফল হল কী? এত বড়ো আধুনিকটাকে তোদের প্রাচীন বলে ভ্রম হয়?

নীরবালা। মুখুজ্যেমশায়, শিব যখন বিবাহসভায় গিয়েছিলেন তখন তাঁর শ্যালীরাও ঐরকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে তো অন্যরকম ঠেকেছিল! তোমার ভাবনা কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন!

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকত তা হলে কি তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করবার জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হত! আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা!

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কী করছিলে?

অক্ষয়। তোদের গয়লাবাড়ির দুধের হিসেব লিখছিলুম।

নীরবালা। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি তুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লাবাড়ির হিসেব? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর-নবনীর অংশটাই বেশি।

অক্ষয়। (ব্যস্তসমস্ত) না না, ওটা নিয়ে গোল করিস নে, আহা, দিয়ে যা–

নৃপবালা। নীরু ভাই, জ্বালাস নে, চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে, ওখানে শ্যালীর উপদ্রব সয় না।– কিন্তু মুখুজ্যেমশায়, তুমি দিদিকে চিঠিতে কী বলে সম্বোধন কর বলো-না!

অক্ষয়। রোজ নূতন সম্বোধন করে থাকি–

নৃপবালা। আজ কী করেছ বলো দেখি।

অক্ষয়। শুনবে? তবে সখী, শোনো। চঞ্চলচকিতচিত্তচকোরচৌরচঞ্চুচুম্বিতচারু-চন্দ্রিকরুচিরুচির চিরচন্দ্রমা।

নীরবালা। চমৎকার চাটুচাতুর্য!

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্যবৃত্তি নেই, চর্বিতচর্বণশূন্য।

নৃপবালা। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, রোজ রোজ তুমি এইরকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরি হয়?

অক্ষয়। ঐজন্যেই তো নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না। ভগবান যে আমাকে সদ্য সদ্য বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটতে দিলে না। ভগ্নীপতির কথা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বল্ দেখি?

নীরবালা। রাগ কোরো না, শান্ত হও মুখুজ্যেমশায়, শান্ত হও। সেজদিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখো, আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করি নে–এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না?

নৃপবালা। আচ্ছা মুখুজ্যেমশায়, সত্যি করে বলো, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তবরচনা করে গান করেছিলুম–

নৃপবালা। তার পরে?

অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উল্‌টো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুন বেড়ে ওঠে তেমনি হল। সেই অবধি স্তবরচনা ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপবালা। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লাবাড়ির হিসেব লিখছ! কী স্তব লিখেছিলে মুখুজ্যেমশায়, আমাদের শোনাও-না।

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবি!

নৃপবালা। না, আমরা দিদিকে বলে দেব না।

অক্ষয়। তবে অবধান করো।–

গান। সিন্ধুকাফি

মনোমন্দিরসুন্দরী,
মণিমঞ্জীরগুঞ্জরী,
স্খলদঞ্চলা চলচঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী।
রোষারুণরাগরঞ্জিতা
বঙ্কিম-ভুরু-ভঞ্জিতা,
গোপনহাস্য -কুটিল-আস্য
কপটকলহগঞ্জিতা।

সংকোচনত-অঙ্গিণী,
ভয়ভঙ্গুরভঙ্গিনী,
চকিতচপল নবকুরঙ্গ
যৌবনবনরঙ্গিণী।
অয়ি খল, ছলগুণ্ঠিতা,
মধুকরভরকুণ্ঠিতা,
লুব্ধপবন -ক্ষুব্ধ-লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা।
চুম্বনধনবঞ্চিনী,
দুরূহগর্বমঞ্চিনী
রুদ্ধকোরক -সঞ্চিত-মধু
কঠিনকনককঞ্জিনী।

কিন্তু আর নয়। এবারে মশায়রা বিদায় হোন।

নীরবালা। কেন, এত অপমান কেন? দিদির কাছে তাড়া খেয়ে আমাদের উপরে বুঝি তার ঝাল ঝাড়তে হবে?

অক্ষয়। এরা দেখছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না। অরে দুর্‌বৃত্তে! এখনই লোক আসবে।

নৃপবালা। তার চেয়ে বলো-না দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে।

নীরবালা। তা, আমরা থাকলেই বা, তুমি চিঠি লেখো-না, আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব না কি?

অক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এইখানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্যন্ত আর পৌঁছয় না। না, ঠাট্টা নয়, পালাও। এখনই লোক আসবে– ঐ একটি বৈ দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

নৃপবালা। এই সন্ধেবেলায় কে তোমার কাছে আসবে?

অক্ষয়। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো, তারা নয়।

নীরবালা। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না, তুমি আজকাল সেটা বেশ বুঝতে পারছ, কী বল মুখুজ্যেমশায়। দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়।

“অবলাকান্তবাবু আছেন?” বলিয়া ঘরের মধ্যে সহসা শ্রীশের প্রবেশ। “মাপ করবেন” বলিয়া পলায়নোদ্যম।

[নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান।

অক্ষয়। এসো এসো শ্রীশবাবু!

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি, কিন্তু অপরাধটা কী আগে বলো।

শ্রীশ। খবর না দিয়েই–

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য ম্যুনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন নাহয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশবাবু।

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন, এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি তা হলেই হল।

অক্ষয়। তাই বললেম। তুমি যখনই আসবে তখনই সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার– শ্রীশবাবু, স্বয়ং বিধাতা সর্বত্র তোমাকে পাস্‌পোর্ট্‌ দিয়ে

রেখেছেন। একটু বোসো, অবলাকান্তবাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই। (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না।

[প্রস্থান

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে একজোড়া মায়া-স্বর্ণমৃগী ছুটে পালালো; ওরে নিরস্ত্র ব্যাধ, তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই! নিকষের উপর সোনার রেখার মতো চকিত চোখের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল!

রসিকের প্রবেশ

শ্রীশ। সন্ধেবেলায় এসে আপনাদের তো বিরক্ত করি নি রসিকবাবু?

রসিক। ভিক্ষুককে বিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষুর্নীরসো ভবেৎ? শ্রীশবাবু, আপনাকে দেখে বিরক্ত হব আমি কি এতবড়ো হতভাগ্য!

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু বাড়ি আছেন তো?

রসিক। আছেন বৈকি, এলেন বলে।

শ্রীশ। না না, যদি কাজে থাকেন তা হলে তাঁকে ব্যস্ত করে কাজ নেই– আমি কুঁড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে সেরা লোকেরাই কুঁড়ে এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ের সম্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ। এই কুঁড়ে-বেকারের মিলনের জন্যেই তো সন্ধেবেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকালবেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দশটা-চারটে, আর সন্ধেবেলাটা, সত্যি কথা বলছি, চিরকুমার-সভার অধিবেশনের জন্যে চতুর্মুখ সৃজন করেন নি। কী বলেন শ্রীশবাবু?

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈকি, সন্ধ্যা চিরকুমার-সভার অনেক পূর্বেই সৃজন হয়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্রবাবুর নিয়ম মানে না–

রসিক। সে, যে চন্দ্রের নিয়ম মানে তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি, হাসবেন না শ্রীশবাবু, আমার একতলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানলা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে– শুক্লসন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কী খবর পাঠালে গো! শুভ্র একটি হংসদূত কোন বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলছে–

অলিন্দে কালিন্দীকমলসুরভৌ কুঞ্জবসতের্-
বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্‌গারচিকুরাং।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয়কলাপব্যজনিনী।

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিকবাবু, চমৎকার! কিন্তু ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে।

রসিক। বাংলায় একটা তর্জমাও করেছি, পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয় তাই লুকিয়ে রেখেছি– শুনবেন শ্রীশবাবু?

কুঞ্জকুটিরের স্নিগ্ধ অলিন্দের ‘পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর।
লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে করিব সেবা, কবে হবে হায়–
কিশলয়-পাখাখানি দোলাইব গায়?

শ্রীশ। বা, বা, রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত আছে তা তো জানতুম না।

রসিক। কী করে জানবেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু এমন ফাঁকা জায়গা আর নেই!

শ্রীশ। আহাহা রসিকবাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ অলিন্দওয়ালা কুঞ্জকুটিরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রি হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু! শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কী? সেই মদ-মুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে পড়ে রয়েছে।

রসিক। দেখি দেখি! তাই তো! দুর্লভ জিনিস আপনার হাতে ঠেকে দেখছি! বাঃ, দিব্যি গন্ধ? শ্লোকের লাইনটা বদলাতে হবে মশায়, ছন্দোভঙ্গ হয় হোক গে– বাসন্তীনবপরিমলোদ্‌গাররুমালাং! শ্রীশবাবু, এ রুমালটাতে তো আমাদের কুমারসভার পতাকা-নির্মাণ চলবে না। দেখেছেন, কোণে কেটি ছোট্ট “ন’ অক্ষর লেখা রয়েছে?

শ্রীশ। কী নাম হতে পারে বলুন দেখি? নলিনী? না, বড্ড চলিত নাম। নীলাম্বুজা? ভয়ংকর মোটা। নীহারিকা? বড়ো বাড়াবাড়ি। বলুন-না রসিকবাবু, আপনার কী মনে হয়?

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে। অভিধানে যত “ন’ আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছে, “ন’য়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে– নির্মলনবনীনিন্দিতনবীন– বলুন-না শ্রীশবাবু– শেষ করে দিন-না–

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ– নির্মলনবনীনিন্দিতনবীননবমল্লিকা! গীতগোবিন্দ মাটি হল। আরো অনেকগুলো ভালো ভালো "ন' মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্ছে, মিলিয়ে দিতে পারছি নে– নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনূপুরনিক্কণ, নিবিড়নীরদনির্মুক্ত– অক্ষয়দাদা থাকলে ভাবতে হত না। মাস্টারমশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে– তেমনি অক্ষয়দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে জুড়ে দাঁড়ায়।– শ্রীশবাবু, বুড়োমানুষকে বঞ্চনা করে রুমালখানা চুপিচুপি পকেটে পুরবেন না–

শ্রীশ। আবিষ্কারকর্তার অধিকার সকলের উপর–

রসিক। আমার ঐ রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশবাবু! আপনাকে তো বলেছি, আমার নির্জন ঘরের একটিমাত্র জানলা দিয়ে একটুমাত্র চাঁদের আলো আসে– আমার একটি কবিতা মনে পড়ে–

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।

কুঞ্জ পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি,
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কী দিয়ে ভোলাই বলুন তো! কাব্যশাস্ত্রের রসালো জায়গা যা-কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায়

চিঁড়ে ভেজে না। সেই দুর্ভিক্ষের সময় ঐ রুমালখানি বড়ো কাজে লাগবে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য দৈবাৎ কখনো দেখেছেন রসিকবাবু?

রসিক। দেখেছি বৈকি, নইলে কি ঐ রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি? আর ঐ যে "ন' অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করে বেড়াচ্ছে তাদের সামনে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্তি নেই?

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঐ মগজটি একটি মৌচাকবিশেষ, ওর ফুকরে ফুকরে কবিত্বের মধু– আমাকে সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি।

[দীর্ঘনিশ্বাসপতন

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ

শৈল। আমার আসতে অনেক দেরি হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশবাবু!

শ্রীশ। আমি এই সন্ধেবেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্তবাবু!

শৈল। রোজ সন্ধেবেলায় যদি এইরকম উৎপাত করেন তা হলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈল। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তা হলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈল। রসিকদাদা, তুমি শ্রীশবাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্ছ কেন? বুড়োবয়সে গাঁটকাটা ব্যাবসা ধরবে না কি?

রসিক। না ভাই, সে ব্যাবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তক্‌রার চলছে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈল। কিরকম?

রসিক। প্রেমের বাজারে বড়ো মহাজনি কারবার মূলধন আমার নেই, আমি খুচরো মালের কারবারী– রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দু-চারটে হাতের অক্ষর, এই-সমস্ত কুড়িয়ে-বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শ্রীশবাবুর যেরকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজারসুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন, রুমাল কেন সমস্ত নীলাঞ্চলে অর্ধেক ভাগ বসাতে পারেন; আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি করতে আসেন কেন?

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আপনি তো নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক্‌, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈল। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করছেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি "ন' অক্ষর লাল সুতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ঐ অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা আছে। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিকবাবু, এ কিরকম জবর্দস্তি? আর "ন' অক্ষরটিও তো বড়ো ভয়ানক অক্ষর!

রসিক। শুনেছি বিলিতি শাস্ত্রে ন্যায়ধর্মও অন্ধ, ভালোবাসাও অন্ধ। এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশি তারই জিত হবে।

শৈল। শ্রীশবাবু, যার রুমাল আপনি তো তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করছেন?

শ্রীশ। দেখি নি কে বললে?

শৈল। দেখছেন? কাকে দেখলেন। "ন' তো দুটি আছে–

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি– তা, এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক, দাবি আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশবাবু, বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না– একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্রবাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন? চন্দ্রবাবুর বাড়ি কাছেই– আমি একবার চট্ করে দেখা করে আসব।

শৈল। পালাবেন না তো?

শ্রীশ। না, আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওখানা খালাস না করে যাচ্ছি নে।

[প্রস্থান

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যেরকম ভয়ংকর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এঁদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারো দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈল। তাই তো দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কী জান? যিনি দার্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এঁরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়ি যে রোগের বীজে ভরা; এখানকার রুমালে, বইয়ে, চৌকিতে, টেবিলে,

যেখানে স্পর্শ করছেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুকছে– আহা, শ্রীশবাবুটি গেল।

শৈল। রসিকদাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে?

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও! আমার পিলে যকৃৎ যা-কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি, আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরছে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে।

নীরবালা। সেজদিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশবাবু কী কাণ্ডটাই করলে? সেজদিদি তো লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা, ভুলেও কিছু ফেলে যাই নি। বারোখানা রুমাল এনেছি, ভাবছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব।

শৈল। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর?

নীরবালা। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোটদিদি, আজকাল তোর কিরকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্ছে তার এক-আধটা নমুনা দেখতে পারি কি?

নীরবালা।

দিন গেল রে, ডাক দিয়ে নে পারের খেয়া,
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া নেয়া।

রসিক। দিদি ভারি ব্যস্ত যে! পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই! যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

"অবলাকান্তবাবু আছেন?" বলিয়া বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচকিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান। নীরবালা মুহূর্ত হতবুদ্ধি হইয়া, দ্রুতবেগে বহিষ্ক্রান্ত।

শৈল। আসুন বিপিনবাবু!

বিপিন। ঠিক করে বলুন, আসব কি? আমি আসার দরুন আপনাদের কোনোরকম লোকসান নেই?

রসিক। ঘর থেকে কিছু লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিনবাবু– ব্যাবসার এইরকম নিয়ম। যা গেল তা আবার দুনো হয়ে ফিরে আসতে পারে, কী বল অবলাকান্ত?

শৈল। রসিকদাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হয়ে আসছে!

রসিক। গুড় জমে যেরকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু, বিপিনবাবু, কী ভাবছেন বলুন দেখি?

বিপিন। ভাবছি কী ছুতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না।

শৈল। বন্ধুত্বে যদি বাধে?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোনো দরকারই হয় না।

শৈল। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভালো হয়ে বসুন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন করুন বিপিনবাবু! আমাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না। আমি তো বৃদ্ধ, যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর আমাদের সুকুমারমূর্তি অবলাকান্তবাবুকে কোনো স্ত্রীলোক পুরুষ বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোনো সুন্দরী কিশোরী ত্রস্তহরিণীর মতো পলায়ন করে থাকেন তা হলে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মস্ত খাতিরটা করেছেন। হায় রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোনো তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না!

বিপিন। রসিকবাবু আপনাকেও যে দলে টানছেন অবলাকান্তবাবু! এ কিরকম হল?

শৈল। কী জানি বিপিনবাবু, আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে– কোনো অবলা তো এ পর্যন্ত আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনো সময় আছে।

শৈল। সে আশা এবং সে সময় যদি থাকত তা হলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এঁর মনের মধ্যে একটা কী বেদনা রয়েছে, নইলে এত অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণভাব থাকত না।– এটা কিসের খাতা? গান লেখা দেখছি। নীরবালা দেবী!

[পাঠ

শৈল। কী পড়ছেন বিপিনবাবু?

বিপিন। কোনো একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করছি, হয়তো তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার সুযোগ পাব না, এবং হয়তো তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না, কিন্তু এই গানগুলি মানিক এবং হাতের অক্ষরগুলি মুক্তো! যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন!

শৈল। বিধাতা মাপ করতে পারেন, কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির 'পরে আমার লোভ আছে বিপিনবাবু!

রসিক। আর, আমি বুঝি লোভ মোহ সমস্ত জয় করে বসে আছি? আহা, হাতের অক্ষরের মতো জিনিস আর আছে? মনের ভাব মূর্তি ধরে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে– অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে, হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে। অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়ো না ভাই! তোমাদের চঞ্চলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরনার মতো দিনরাত ঝরে পড়ছে, তাকে তো ধরে রাখতে পার না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারই একটি গণ্ডুষ ভরে উঠেছে– এ জিনিসের দাম আছে! বিপিনবাবু, আপনি তো নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কী করবেন?

বিপিন। আপনারা তো স্বয়ং তাঁকেই জানেন– খাতাখানিতে আপনাদের প্রায়োজন কী? এই খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন?

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়– সেদিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলাম, নৃপবালা, নীরবালা– এ কী, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলুম আমার সেই সন্ন্যাস-সম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে। ওঁর যেরকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ওঁর ঐ চন্দ্রকলার মতো কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা প'রে, হাতে একটি বীণা নিয়ে সকালবেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন?

রসিক। বুঝতে পারছি নে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুরি দরকার হয়েছে?

শ্রীশ। চিরকুমার-সভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কী? তবে আমার দ্বারা কী কাজ পাবেন?

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যেরকম উত্তাপ আছে আপনি উত্তরমেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন।– বিপিন, উঠছ নাকি?

বিপিন। যাই, আমাকে রাত্রে একটু পড়তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করছেন পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরত পাওয়া যাবে?

বিপিন। (জনান্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক্।

শৈল। (মৃদুস্বরে) শ্রীশবাবু, ইতস্তত করছেন কেন, আপনার কিছু হারিয়েছে নাকি?

শ্রীশ। (মৃদুস্বরে) আজ থাক্, আর-একদিন খুঁজে দেখব।

[শ্রীশ ও বিপিনের প্রস্থান

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কী রকমের ডাকাতি দিদি! আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল! আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীরবালা। আচ্ছা পণ্ডিতমশায়, তোমার অভিধান জাহির করতে হবে না– আমার খাতা ফিরিয়ে আনো।

রসিক। পুলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যাবসা নয়।

নীরবালা। কেন, দিদি, তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে?

শৈল। এমন অমুল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস কেন?

নীরবালা। আমি বুঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি?

রসিক। লোকে সেইরকম সন্দেহ করছে।

নীরবালা। না রসিকদাদা, তোমার ও ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা!

[সক্রোধে নীরবালার প্রস্থান

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ

রসিক। কী নৃপ, হারাধন খুঁজে বেড়াচ্ছিস?

নৃপবালা। না, আমার কিছু হারায় নি।

রসিক। সে তো অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্ছে না, তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস। (শৈলের হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিসটা কার ভাই?

নৃপবালা। ও আমার নয়।

[পলায়নোদ্যত

রসিক। (নৃপকে ধরিয়া) যে জিনিসটা খোওয়া গেছে নৃপ তার উপরে কোনো দাবিও রাখতে চায় না।

নৃপবালা। রসিকদাদা, ছাড়ো– আমার কাজ আছে।

দশম পরিচ্ছেদ

পথে বাহির হইয়াই শ্রীশ কহিল, "ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনই ঘুমোতে কিম্বা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তা হলে দেবতারা ধিক্‌কার দেবেন।"

বিপিন। তাঁদের ধিক্‌কার খুব সহজে সহ্য হয়, কিন্তু ব্যামোর ধাক্কা কিম্বা–

শ্রীশ। দেখো, ঐজন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিনে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় বলে মলয় সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদুরিটা কী জিজ্ঞাসা করি? আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি, আমার ফুল ভালো লাগে, জ্যোৎস্না ভালো লাগে, দক্ষিনে হাওয়া ভালো লাগে–

বিপিন। এবং–

শ্রীশ। এবং যা কিছু ভালো লাগবার মতো জিনিস সবই ভালো লাগে।

বিপিন। বিধাতা তো তোমাকে ভারি আশ্চর্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখছি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরো আশ্চর্য। তোমার লাগে ভালো, কিন্তু বল অন্য রকম– আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মতো– সে চলে ঠিক, কিন্তু বাজে ভুল।

বিপিন। কিন্তু শ্রীশ, তোমার যদি সব মনোহর জিনিসই মনোহর লাগতে লাগল তা হলে তো আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি তো কিছুই বিপদ বোধ করি নে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই তো সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনাবোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি, ভাই, স্পষ্টই কবুল করছি স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে– চিরকুমার-সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তা হলে তাঁকে খুব তফাত দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল! তুমি তফাতে থাকলে কী হবে, তাঁরা তো তফাতে থাকেন না। সংসাররক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্টি করতে হয়েছে যে তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য যদি রক্ষা করতে চাও তা হলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ঐ-যে স্ত্রীসভ্য নেবার নিয়ম হয়েছে, এতদিন পরে কুমারসভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু কেবল একটিমাত্র মহিলা হলে চলবে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বদ্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাকলে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ঐ খোলা হাওয়া বন্ধ হাওয়া বুঝি নে ভাই! যার সর্দির ধাত তাকে সর্দি থেকে রক্ষা করতে দেবতা মনুষ্য কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কী বলছে হে?

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বললেই বুঝতে পারবে তোমার ধাতের সঙ্গে তার চমৎকার মিল আছে। নাড়ীটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ীর মতো চলে তা জাঁক করে বলতে পারব না।

শ্রীশ। ঐটে তোমার আর-একটা ভুল। চিরকুমারের নাড়ীর উপর ঊনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও– কোনো ভয় নেই– বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের মতো ব্রত যাদের, তারা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখতে পারে? তাকে অশ্বমেধযজ্ঞের ঘোড়ার মতো ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সঙ্গে লড়াই করো।

বিপিন। ও কে হে! পূর্ণ দেখছি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরোবার জো নেই। ঐ বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্ছে। ওকে একবার ডাক দেব?

শ্রীশ। ডাকো। ও কিন্তু আমাদেরই দুজনকে অন্বেষণ করে গলিতে গলিতে ঘুরছে বলে বোধ হচ্ছে না।

বিপিন। পূর্ণবাবু, খবর কী?

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল-পরশু যে-খবর চলছিল আজও তাই চলছে।

শ্রীশ। কাল-পরশু শীতের হাওয়া বচ্ছিল, আজ বসন্তের হাওয়া দিয়েছে– এতে দুটো-একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে।

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে-সব খবরের সৃষ্টি হয়, কুমারসভার খবরের কাগজে তার স্থান নেই। তপোবনে একদিন অকালে বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল, তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হয়েছে– আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় তো হোক-না পূর্ণবাবু– সে কাব্যে যে দেবতা দগ্ধ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার-সভা দগ্ধ হোক। যে দেবতা জ্বলেছিলেন তিনি জ্বালান। না, আমি ঠাট্টা করছি নে শ্রীশবাবু, আমাদের চিরকুমার-সভাটি একটি আস্ত জতুগৃহবিশেষ। আগুন লাগলে রক্ষে নেই। তার চেয়ে বিবাহিত-সভা স্থাপন করো, স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাকবে। যে ইঁট পাঁজায় পুড়েছে তা দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে।

শ্রীশ। যে-সে লোক বিবাহ করে করে বিবাহ জিনিসটা মাটি হয়ে গেছে পূর্ণবাবু! সেইজন্যেই তো কুমারসভা। আমার যতদিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আসুন তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাস্, আর ভয় নেই।

পূর্ণ। দেখো শ্রীশবাবু!

শ্রীশ। দেখব আর কী? তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এক চোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন–

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া,
তোমার অনল দিয়া।
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি!
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া।
নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

পূর্ণ। ওহে শ্রীশবাবু, তোমার কবিটি তো মন্দ লেখে নি!–

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

ঘরটি সাজানো রয়েছে– থালায় মালা, পালঙ্কে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবনপ্রদীপটি জ্বলছে না, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হতে চলল!– বাঃ দিব্যি লিখেছে! কোন্ বইটাতে আছে বলো দেখি?

শ্রীশ। বইটার নাম আবাহন।

পূর্ণ। নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভালো। (আপন-মনে)–

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

[দীর্ঘনিশ্বাস

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেছ?

শ্রীশ। বাড়ি কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই!

পূর্ণ। আজ পথ ভোলবার মতোই রাতটা হয়েছে বটে। কী বল বিপিনবাবু?

শ্রীশ। বিপিনবাবু এ-সকল বিষয়ে কোনো কথাই কন না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে। কৃপণ যে জিনিসটার বেশি আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুঁতে রাখে।

বিপিন। অস্থানে বাজে খরচ করতে চাই নে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্ছি। মরতে হলে একবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভালো।

পূর্ণ। এ তো উত্তম কথা, শাস্ত্রসংগত কথা। বিপিনবাবু একেবারে অন্তিমকালের জন্যে কবিত্ব সঞ্চয় করে রাখছেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নিরুত্তর। আশীর্বাদ করি অন্যের সেই বাক্যগুলি যেন মধুমাখা হয়–

শ্রীশ। এবং তার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে–

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্তব্য নিঃশেষ না হয়–

পূর্ণ। বাক্যের বিরামস্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হয়ে ওঠে।

শ্রীশ। সেদিন নিদ্রা যেন না আসে–

পূর্ণ। রাত্রি যেন না যায়–

বিপিন। চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়–

পূর্ণ। বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে–

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জদ্বারের কাছে এসে উঁকিঝুঁকি না মারে।

পূর্ণ। দূর হোক গে শ্রীশবাবু, তোমার সেই আবাহন থেকে আর-একটা কিছু কবিতা আওড়াও। চমৎকার লিখেছে হে–

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

আহা! একটি জীবনপ্রদীপের শিখাটুকু আর-একটি জীবনপ্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়– দুটি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে প্রদীপখানি একটু হেলিয়ে একটু ছুঁইয়ে যাওয়া, তার পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত। (আপন-মনে)–

নিশি না পোহাতে জীবনপ্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, যাও কোথায়!

পূর্ণ। চন্দ্রবাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি, সেইটে খুঁজতে যাচ্ছি।

বিপিন। খুঁজলে পাবে তো? চন্দ্রবাবুর বাসা বড়ো এলোমেলো জায়গা– সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া যায় না।

[পূর্ণের প্রস্থান

শ্রীশ। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন!

বিপিন। ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওয়াটারের ছিপির মতো একেবারে টপ্ করে উড়ে না যায়!

শ্রীশ। যায় তো যাক-না। কোনোমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম পুরুষার্থ? মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাতদিন মুটের বোঝার মতো মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্ছি কেন? দাও ভাই, তার কেটে, একবার উড়ুক।– সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম–

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।
খোলা আঁখি দুটো অন্ধ করে দে
আকুল আঁখির নীরে।
সে ভোলা পথের প্রান্তে রয়েছে
হারানো হিয়ার কুঞ্জ,
ঝরে পড়ে আছে কাঁটাতরুতলে
রক্তকুসুমপুঞ্জ–
সেথা দুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূলসিন্ধুতীরে।
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে।

বিপিন। আজকাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মুশকিলে পড়বে দেখছি!

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে করে মুশকিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার জন্যে কেউ ভেবো না। মুশকিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মুশকিলের মধ্যে পা ফেললেই বিপদ।– আসুন আসুন রসিকবাবু, রাত্রে পথে বেরিয়েছেন যে?

রসিকের প্রবেশ

রসিক। আমার রাতই বা কী, আর দিনই বা কী!

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা
ননু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ।

শ্রীশ। অস্যার্থঃ?

রসিক। অস্যার্থ হচ্ছে–

আসে তো আসুক রাতি, আসুক বা দিবা,
যায় যদি যাক নিরবধি।
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি।

অনেকগুলো দিন রাত এ-পর্যন্ত এসেছে এবং গেছে, কিন্তু তিনি আজ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন না– তাই, দিনই বলুন আর রাতই বলুন, ও দুটোর 'পরে আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, প্রিয়জন এখনই যদি হঠাৎ এসে পড়েন?

রসিক। তা হলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন!

শ্রীশ। তা হলে তদ্দণ্ডেই তিনি অরসিক বলে প্রকাশ হয়ে যাবেন।

রসিক। এবং পরদণ্ডেই পরমানন্দে কালযাপন করতে থাকবেন। তা, আমি ঈর্ষা করতে চাই নে শ্রীশবাবু! আমার ভাগ্যে যিনি আসতে বহু বিলম্ব করলেন, আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করলুম। দেবী, তোমার বরমাল্য গেঁথে আনো। আজ বসন্তের শুক্ল রজনী, আজ অভিসারে এসো!

মন্দং নিধেহি চরণৌ পরিধেহি নীলং
বাসঃ পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন।
মা জল্প সাহসিনি শারদচন্দ্রকান্ত-
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।
ধীরে ধীরে চলো তন্বী, পরো নীলাম্বর,
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখো কঙ্কণ মুখর।
কথাটি কোয়ো না, তব দন্ত-অংশুরুচি
পথের তিমিররাশি পাছে ফেলে মুছি।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা। এমন কত তর্জমা করে রেখেছেন?

রসিক। বিস্তর– লক্ষ্মী তো এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করছি।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, অভিসার ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্বার চালাবার জন্যে চিরকুমার-সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখো-না।

শ্রীশ। কতকগুলো জিনিস আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে, সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে, সে রাস্তা কি তোমার পটোলডাঙা স্ট্রীট? সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বরী প'রে মনোরাজ্যের পথে ঐরকম করে বেরিয়ে থাকে–

বক্ষের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে পড়ে, চেয়েও দেখে না– সত্যিকার মুক্তো হলে কুড়িয়ে নিত। কী বলেন রসিকবাবু?

রসিক। সে কথা মানতেই হয়– অভিসারটা মনে মনেই ভালো, গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বেমানান। আশীর্বাদ করি শ্রীশবাবু, এইরকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোনো-একটি জানলা থেকে কোনো-এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাবু, আপনার আশীর্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্ছি। বিশে ডাকাত যেমন খবর দিয়ে ডাকাতি করত, আমায় অজানা অভিসারিকা তেমনি পূর্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা, আমার সেই দক্ষিণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর-একটি চৌকি সাজানো থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আসবেন তখন হতভাগার ভাগ্যে লগুড়ং দদ্যাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশবাবু, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে যে পতাকা ওড়ানো আবশ্যক সেটা যে ফেলে এলেন!

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে?

রসিক। চেষ্টা করতে দোষ কী?

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্তা কও, আমি চট্ করে আসছি। [প্রস্থান

বিপিন। আচ্ছা রসিকবাবু, রাগ করবেন না।

রসিক। যদি বা করি, আপনার ভয় করবার কোনো কারণ নেই– আমি ভারি দুর্বল।

বিপিন। দুই-একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব, আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নয় তো?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন, ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সেদিন যে মহিলাটিকে দেখলাম, তিনি–

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সংকোচ করবেন না বিপিনবাবু– তাঁর সম্বন্ধে যদি আপনি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না, আমরাও ঠিক ঐ কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাবু বুঝি–

রসিক। তাঁর কথা বলবেন না– তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি–

রসিক। হাঁ, তাই বটে। তবে হয়েছে কী, তিনি নৃপবালা নীরবালা দুজনের কাকে যে বেশি ভালোবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না– তিনি দুজনের মধ্যে সর্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু তাঁদের কেউ ওঁর প্রতি–

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে, ওঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে তো কোনো গোলই ছিল না!

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্তবাবু কিছু–

রসিক। কিছু যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভালোবাসেন?

রসিক। বাসেন বটে, আপনার পকেটের মধ্যেই তো তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে–

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না করলে আমরা কেউ-না-কেউ করতেম।

বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জনা করতেন, কিন্তু আমি– বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিলেও তো–

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব–

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষটুকু হয়েছে রক্ষণে না-হয় তাতে আর-একটু যোগ হল।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন?

রসিক। বলেছেন অল্পই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কিরকম?

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারই।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় উষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু!

রসিক। দলে টানছি মশায়!

বিপিন। (খাতা পুনর্বার পকেটে পুরিয়া) ইংরাজিতে বলে দোষ করা মানবের ধর্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম পালনটাই সাব্যস্ত করলেন!

বিপিন। দেবীর ধর্মে যা বলে তিনি তাই করবেন!

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সন্ন্যাসী করতে চাও নাকি?

শ্রীশ। যা হোক, অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম– একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসি গে।

রসিক। (জনান্তিকে) পুনর্বার কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুঝি? মানবধর্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরছে!

[বিপিনের প্রস্থান

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার কাছে আমার একটা পরামর্শ আছে।

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুদ্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সেদিন যে দুটি মহিলাকে দেখেছিলেম, তাঁদের দুজনকেই আমার সুন্দরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশক্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই তো ঐ এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করি তা হলে কি–

রসিক। তা হলে আমি খুশি হব, আপনারও সেটা ভালো লাগতে পারে এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লি যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে–

রসিক। তাতে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রারোগ জন্মাতে পারে, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ তো তাই বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বলতে হবে।

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্‌টি?

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলুন দেখি।

শ্রীশ। যাঁর সেই লাল রঙের রেশমের শাড়ি পরা ছিল?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন, অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ করছিলেন– তাই মুহূর্তকালের মতো হঠাৎ ত্রস্তহরিণীর মতো থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, সামনের দুই-এক গুচ্ছ চুল প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল– চাবির-গোছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তাঁর পিঠ-ভরা কালো চুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মতো ছুটে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ তো নৃপবালাই বটে! পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি ত্রস্ত, চুলগুলি কুঞ্চিত, দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি– সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকোনো মধুটুকুর মতো মধুর, শিশিরটুকুর মতো করুণ।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত যে কবিত্বরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক। ধরা পড়েছি শ্রীশবাবু–

কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনমালাতপরুচিং

ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীং
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্‌ভির্বিদধাতি সভারঞ্জনময়ীম্‌।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণলেখা যে তুমি, তোমাকে যাঁরা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্য-দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্তকমলবনের কিরণলেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অল্পদিন হল একটু পরিচয় পেয়েছি, তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে।

অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখছি। একটি তো গিয়ে চোরের মতো আমার ঘরের মধ্যে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলেন– ধরা পড়ে ভালোরকম জবাবদিহি করতে পারলে না, শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উলটে-পালটে নিরীক্ষণ করছে। তফাত থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মতো করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না। আহা, চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে।

শ্রীশ। এই-যে অক্ষয়বাবু!

অক্ষয়। ঐ রে! একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর-একটা ডাকাত গলির মোড়ে। হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করছে তারা মেনকা উর্বশী রম্ভা হলে আমার কোনো খেদ ছিল না– মনের মতো ধ্যান-ভঙ্গও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই– কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশি হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে!

বিপিনের প্রবেশ

বিপিন। এই-যে অক্ষয়বাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম!

অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল?–

In such a night as this,
When the sweet wind did gently kiss the trees,
And they did make no noise, in such a night
Troilus methinks mounted the Troyan walls
and sighed his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night.

শ্রীশ। In such a night আপনি কী করতে বেরিয়েছেন অক্ষয়বাবু?

রসিক।

অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা।
চক্ষু'পরে মৃগাক্ষীর চিত্রখানি ভাসে–
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে।

অক্ষয়বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায়!

অক্ষয়। তুমি কে হে?

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র– দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবনসাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিকদাদা!

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা তো জানি নে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশবাবু, আপনার কিরকম বোধ হচ্ছে।

শ্রীশ। এখনো সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি।

রসিক। আমার মতো পরিণত বয়সের জন্যে অপেক্ষা করছেন বুঝি? অক্ষয়দা, আজ তোমাকে বড়ো অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

অক্ষয়। তুমি তো অন্যমনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই।– বিপিনবাবু, তুমি আমাকে খুঁজছিলে বললে বটে, কিন্তু খুব যে জরুরি দরকার আছে বলে বোধ হচ্ছে না, অতএব আমি এখন বিদায় হই– একটু বিশেষ কাজ আছে।

[প্রস্থান

রসিক। বিরহী চিঠি লিখতে চলল।

শ্রীশ। অক্ষয়বাবু আছেন বেশ।– রসিকবাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড়ো বোন? তাঁর নাম?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কী নাম বললেন?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়ো?

রসিক। হাঁ।

বিপিন। সব ছোটোটির নাম?

রসিক। নীরবালা।

শ্রীশ। আর, নৃপবালা কোন্‌টি?

রসিক। তিনি নীরবালার বড়ো।

শ্রীশ। তা হলে নৃপবালাই হলেন মেজো।

বিপিন। আর নীরবালা ছোটো।

শ্রীশ। পুরবালার ছোটো নৃপবালা।

বিপিন। তাঁর ছোটো হচ্ছেন নীরবালা।

রসিক। (স্বগত) এরা তো নাম জপ করতে শুরু করলে। আমার মুশকিল। আর তো হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক।

বনমালীর প্রবেশ

বনমালী। এই-যে, আপনারা এখানে! আমি আপনাদের বাড়ি গিয়েছিলুম।

শ্রীশ। এইবার আপনি এখানে থাকুন, আমরা বাড়ি যাই।

বনমালী। আপনারা সর্বদাই ব্যস্ত দেখতে পাই।

বিপিন। তা, আপনি আমাদের কখনো সুস্থ দেখেন নি– একটু বিশেষ ব্যস্ত হয়েই পড়ি।

বনমালী। পাঁচ মিনিট যদি দাঁড়ান।

শ্রীশ। রসিকবাবু, একটু ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না?

রসিক। আপনাদের এতক্ষণে বোধ হল, আমার অনেকক্ষণ থেকেই বোধ হচ্ছে।

বনমালী। চলুন-না, ঘরেই চলুন-না!

শ্রীশ। মশায়, এত রাত্রে যদি আমার ঘরে ঢোকেন তা হলে কিন্তু–

বনমালী। যে আজ্ঞে, আপনারা কিছু ব্যস্ত আছেন দেখছি, তা হলে আর-এক সময় হবে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

রসিক। ভাই শৈল!

শৈল। কী রসিকদাদা!

রসিক। এ কি আমার কাজ? মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন, আর আমি বৃদ্ধ–

শৈল। তুমি তো বৃদ্ধ, তেমনি যুবক দুটিও তো যুগল মহাদেব নন!

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাহর করেই দেখেছি। সেইজন্যই তো নির্ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্ধেক রাত পর্যন্ত রসালাপ করবার মতো উত্তাপ আমার শরীরে তো নেই!

শৈল। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চয় করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্যের তাপে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে, মরা কাঠ তাতেই ফেটে যায়– যৌবনের উত্তাপ বুড়োমানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈল। কই, তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে তো বোধ হচ্ছে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখলে বুঝতে পারতিস ভাই!

শৈল। কী বল রসিকদা! তোমারই তো এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কী করবে?

রসিক। শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিম্। যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হুহুঃ শব্দে জ্বলে ওঠে– সেইজন্যেই তো "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা' বিপত্তির কারণ! কী আর বলব ভাই!

নীরবালার প্রবেশ

রসিক। আগচ্ছ বরদে দেবি! কিন্তু, বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানি নে, আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত করে মরছি। শিব তো কিছুই করছেন না, তবু তোমাদের পুজো পাচ্ছেন; আর এই-যে বুড়ো খেটে মরছে, এ কি কিছুই পাবে না?

নীরবালা। শিব পান ফুল, তুমি পাবে তার ফল– তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিকদাদা!

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে, সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়– আমাকেও নির্ভয়ে বরমাল্য দিতে পারিস, যখনই দরকার হবে তখনই ফিরে পাবি– তার চেয়ে, ভাই, আমাকে একটা গলাবন্ধ বুনে দিস, বরমাল্যের চেয়ে সেটা বুড়োমানুষের কাজে লাগবে।

নীরবালা। তা দেব– একজোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি, সেই শ্রীচরণেষু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে। কিন্তু, নীরু, আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট– আপাদমস্তক নাই হল। সেজন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তাঁরই জন্যে রেখে দে।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার বক্তৃতাও তুমি রেখে দাও।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে– লক্ষণ খারাপ।

শৈল। নীরু, তুই করছিস কী! আবার এ ঘরে এসেছিস! আজ যে এখানে আমাদের সভা বসবে– এখনই কে এসে পড়বে, বিপদে পড়বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও একবার পেয়েছে, এখন বারবার বিপদে পড়বার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে বেড়াচ্ছে।

নীরবালা। দেখো রসিকদাদা, তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা হলে গলাবন্ধ পাবে না বলছি। দেখো দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ঐরকম করে হাস তা হলে ওঁর আস্পর্ধা আরো বেড়ে যায়।

রসিক। দেখেছিস ভাই শৈল, নীরু আজকাল ঠাট্টাও সইতে পারছে না, মন এত দুর্বল হয়ে পড়েছে। নীরুদিদি, কোনো কোনো সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে এইরকম শাস্ত্রে আছে, তোর রসিকদাদার ঠাট্টাকেও কি তোর আজকাল কুহুতান বলে ভ্রম হতে লাগল?

নীরবালা। সেইজন্যেই তো তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্ছি– তানটা যদি একটু কমে।

শৈল। নীরু, আর ঝগড়া করিস নে– আয়, এখনই সবাই এসে পড়বে।

[উভয়ের প্রস্থান

পূর্ণর প্রবেশ

রসিক। আসুন পূর্ণবাবু–

পূর্ণ। এখনো আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বুঝি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছেন। আরো সকলে আসবেন পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিকবাবু?

রসিক। তা কেমন করে বলব বলুন। কিন্তু ঘরে যেই ঢুকলেন আপনার দুটি চক্ষু দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে সে ব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষুতত্ত্বে আপনার এতদূর অধিকার হল কী করে?

রসিক। আমার পানে কেউ কোনোদিন তাকায় নি পূর্ণবাবু, তাই এই প্রাচীন বয়স পর্যন্ত পরের চক্ষু পর্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মতো শুভাদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টি লাভ করতে পারতুম। কিন্তু যাই বলুন পূর্ণবাবু, চোখ দুটির

মতো এমন আশ্চর্য সৃষ্টি আর কিছু হয় নি– শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিকবাবু! ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিম্বা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ঐ দুটি চোখে।

রসিক।

নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ং
অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলং–

বুঝেছেন পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক।

আনতাঙ্গী বালিকার শোভাসৌভাগ্যের সার নয়নযুগল
না দেখিয়া পরস্পরে তাই কি বিরহভরে হয়েছে চঞ্চল?

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হল না। ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখতে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় তো? সেইরকম অর্থ করেই নিন-না! শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক–

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিকবাবু!

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

অথচ সে বেচারা বন্দী খাঁচার পাখির মতো কেবল এ পাশে ও পাশে ছট্‌ফট্ করে– প্রিয়চক্ষু যেখানে, সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না।

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কিরকম নিদারুণ তাও শাস্ত্রে লিখেছে–

হত্বা লোচনবিশিখৈর্গত্বা কতিচিৎ পদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি।
বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,
জনমে অনুশোচনা–
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা!

পূর্ণ। রসিকবাবু, বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে চাবার কোনো অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ঐরকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত পূর্ণবাবু– এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না।

পূর্ণ। (সনিশ্বাসে) বড়ো বিশ্রী জায়গা রসিকবাবু! কিন্তু ওটা আপনি বেশ বলেছেন–

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

রসিক। আহা পূর্ণবাবু, নয়নের কথা যদি উঠল ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না–

লোচনে হরিণগর্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ।
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ?
হরিণগর্বমোচন লোচনে

কাজল দিয়ো না সরলে!
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ,
কী কাজ লেপিয়া গরলে?

পূর্ণ। থামুন রসিকবাবু, থামুন। ঐ বুঝি কারা আসছেন।

চন্দ্রবাবু ও নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্র। এই-যে অক্ষয়বাবু–

রসিক। আমার সঙ্গে অক্ষয়বাবুর সাদৃশ্য আছে শুনলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

চন্দ্র। মাপ করবেন রসিকবাবু– হঠাৎ ভ্রম হয়েছিল।

রসিক। মাপ করবার কী কারণ ঘটেছে মশাই! আমাকে অক্ষয়বাবু ভ্রম করে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন। পূর্ণবাবুতে আমাতে এতক্ষণ বিজ্ঞানচর্চা করছিলুম চন্দ্রবাবু!

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান-আলোচনার জন্যে স্থির করব মনে করেছিলুম। আজ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, সে কিছুই নয় চন্দ্রবাবু!

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দু-চার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারি শক্ত রসিকবাবু!

রসিক। শক্ত বৈকি– পূর্ণবাবুরও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিসের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্‌টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে কোনো মতই আমার সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন করে। সোজা দেখা বাঁকা দেখা এই-সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। বিষয়টা বড়ো সংকটময়।

চন্দ্র। নির্মলার সঙ্গে রসিকবাবুর পরিচয় হয় নি? ইনিই আমাদের কুমারসভার প্রথম স্ত্রীসভ্য।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধিবিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রসিক। একই কথা চন্দ্রবাবু– শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্‌ভূতা হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না। কী বলেন পূর্ণবাবু?

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ

শৈল। মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে?

চন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) না, এখনো সময় হয় নি। অবলাকান্তবাবু, আমার ভাগ্নী নির্মলা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন।

শৈল। (নির্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন, পুরুষেরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যেই বিশেষ করে বদ্ধ করে রাখতে চায়– চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নির্মলা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই। আমি যদি আপনাদের সভার কোনো উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে।

শৈল। আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্রবাবুকে ভালো করে জানবার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য।

নির্মলা। আমি ওঁকে জানব না তো কে জানবে?

শৈল। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটোকে বড়ো করে তোলে বটে, তেমনি বড়োকেও ছোটো করে আনে। চন্দ্রবাবুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্মলা। কিন্তু আমার মামাকে যথার্থভাবে জানা খুব সহজ। ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে!

শৈল। দেখুন, সেইজন্যেই তো ওঁকে ঠিকমত জানা শক্ত। দুর্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে বুঝতে পারে? তাকে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্মলা। আপনি ঠিক কথা বলেছেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এতদিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শুনে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে সে কী বলব।

শৈল। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেইরকম আনন্দ দিচ্ছে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্তবাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলেম সেটা পড়েছ?

শৈল। পড়েছি এবং তার থেকে সমস্ত নোট করে আপনার ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারি উপকার হবে, আমি বড়ো খুশি হলুম অবলাকান্তবাবু! পূর্ণ নিজে আমার কাছে ঐ বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর শরীর ভালো ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে?

শৈল। এনে দিচ্ছি।

[প্রস্থান

রসিক। পূর্ণবাবু, আপনাকে কেমন ম্লান দেখছি, অসুখ করেছে কি?

পূর্ণ। না, কিছুই না। রসিকবাবু, যিনি গেলেন এঁরই নাম অবলাকান্ত?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভালো ঠেকছে না।

রসিক। অল্প বয়স কিনা সেইজন্যে–

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কিরকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি, মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার করতে জানেন না– কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব। ওটা হয়তো অল্প বয়সের ধর্ম।

পূর্ণ। আমাদেরও তো বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা তো–

রসিক। তা তো দেখছি, আপনি খুব দূরে দূরেই থাকেন, কিন্তু উনি হয়তো সেটাকে ঠিক ভদ্রতা বলেই গ্রহণ করেন না। ওঁর হয়তো ভ্রম হচ্ছে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণ। বলেন কী রসিকবাবু? কী করব বলুন তো। আমি তো ভেবেই পাই নে কী কথা বলবার জন্যে আমি ওঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন, তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিকবাবু, আমার একটা কথাও বেরোয় না। কী বলব আপনিই বলুন-না।

রসিক। এমন কোনো কথাই বলবেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কিরকম গরম পড়েছে।

পূর্ণ। তিনি যদি বলেন হাঁ গরম পড়েছে, তার পরে কী বলব?

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। (চন্দ্রবাবু ও নির্মলাকে নমস্কার করিয়া, নির্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়ির চেয়ে এগিয়ে চলেছে– এই দেখুন, এখনো সাড়ে ছটা বাজে নি।

নির্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন, সেইজন্যে সভা বসবার পূর্বেই এসেছি– প্রথম সভ্য হবার সংকোচ ভাঙতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু আপনার কাছে নিবেদন এই যে, আমাদের কিছুমাত্র সংকোচ করে চলবেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন– লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ-সভ্যগুলিকে অনুগ্রহ করে দেখবেন শুনবেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

রসিক। যান পূর্ণবাবু, আপনিও একটা কথা বলুনগে।

পূর্ণ। কী বলব?

নির্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন?

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কী আছে, কিন্তু আগুন তো লোহাকে চালাচ্ছে– আমাদের মতো ভারী জিনিসগুলোকে চলনসই করে তুলতে আপনাদের মতো দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুনছেন তো পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। আমি কী বলব বলুন-না।

রসিক। বলুন লোহাকে চালাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই!

বিপিন। কী পূর্ণবাবু, রসিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভালো আছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। অনেকক্ষণ এসেছেন না কি?

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন?– এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝামাঝি একেবারে খপ্ করে থেমে গেল।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই-যে পূর্ণবাবু, গেল বারে আপনার শরীর খারাপ ছিল– এবারে বেশ ভালো বোধ হচ্ছে তো?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতদিন কুমারসভার যে কী একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুঝতে পেরেছি; সোনার মুকুটের মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল– আজ সেইটি বসানো হয়েছে, কী বলেন পুর্ণবাবু!

পূর্ণ। আপনাদের মতো এমন রচনাশক্তি আমার নেই– আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাঁটতে পারি নে– বিশেষত মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হলেম পুর্ণবাবু– আশা করি ক্রমে উন্নতিলাভ করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীরপুরুষে যুদ্ধ চলুক, এখন আসুন রসিকবাবু, আপনার সঙ্গে দুই-একটা কথা আছে। দেখুন, সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোনো কথা উঠেছিল?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম আর ক্ষমা করা দেবীর– সে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলেছেলিম–

বিপিন। তাকে কী বললেন?

রসিক। কিছু না বলে বিদ্যুতের মতো চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন?

রসিক। কিন্তু সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জন?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে?

রসিক। এক প্রান্তে কিম্বা অন্য প্রান্তে একটু হয়তো বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ?

রসিক। কী জানি মশায়! অর্থও থাকতে পারে অনর্থও থাকতে পারে।

বিপিন। রসিকবাবু, আপনি কী বলেন আমি কিছু বুঝতে পারি নে।

রসিক। কী করে বুঝবেন– ভারী শক্ত কথা।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কী শক্ত কথা মশায়?

রসিক। এই বৃষ্টিবজ্রবিদ্যুতের কথা!

শ্রীশ। ওহে বিপিন, তার চেয়ে শক্ত কথা যদি শুনতে চাও তা হলে পূর্ণর কাছে যাও।

বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমার খুব বেশি শখ নেই ভাই!

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশি দুরূহ– সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠাণ্ডা করে এসোগে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ রসিকবাবুর সঙ্গে বৃষ্টিবজ্রবিদ্যুতের আলোচনা করে নিই। (বিপিনের প্রস্থান) রসিকবাবু, ঐ-যে সেদিন আপনি যাঁর নাম নৃপবালা বললেন, তিনি– তিনি– তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলুন। সেদিন চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটি স্নিগ্ধ ভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই থামাতে পারছি নে।

রসিক। বিস্তারিত করে বললে কৌতূহল আরো বেড়ে যাবে। এরকম কৌতূহল "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে'। আমি তো তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আসছি কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে "ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি'।

শ্রীশ। আচ্ছা, তিনি– আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করছি–

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারছি।

শ্রীশ। তা, তিনি– কী আর প্রশ্ন করব? তাঁর সম্বন্ধে যা-হয়-কিছু বলুন-না। কাল কী বললেন, আজ সকালে কী করলেন, যত সামান্য হোক আপনি বলুন আমি শুনি।

রসিক। (শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড়ো খুশি হলুম শ্রীশবাবু, আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন– আপনি তাঁকে কেবল চকিতের মধ্যে দেখে এটুকু কী করে ধরতে পারলেন যে তাঁর সম্বন্ধে তুচ্ছ কিছুই নেই। তিনি যদি বলেন, রসিকদা, ঐ কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উসকে দাও তো, আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম– আদি কবির প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মতো। কী বলব শ্রীশবাবু, আপনি শুনলে হয়তো হাসবেন, সেদিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে সুতো পরাচ্ছেন, কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে, আমার মনে হল এক আশ্চর্য দৃশ্য। কতবার কত দর্জির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো মুখ তুলে দেখি নি, কিন্তু–

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন?

শৈলের প্রবেশ

শৈল। রসিকদার সঙ্গে কী পরামর্শ করছেন?

রসিক। কিছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলছে, যত দূর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা-অধিবেশনের সময় হয়েছে, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাবু, কৃষিবিদ্যালয়-সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ করো।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ– আজ– [কাসি

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা–

পূর্ণ। আজ এই সভা–

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে–

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে–

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদুস্বরে) বলে যান পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কী পূর্ণবাবু, বলে যান।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য এবং গৌরব– (কাসি) যে নূতন সৌন্দর্য (পুনরায় কাসি) অভিনন্দন–

রসিক। (উঠিয়া) সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণবাবু সকল সভ্যের পূর্বেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সম্বরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখি প্রত্যুষেই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছেন– কিন্তু দেহ রুগ্‌ণ, তাই পূর্ণহৃদয়ের আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করবার শক্তি নেই– অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিষ্কৃতি দান করতে হবে। এবং আজ নবপ্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণবাবু, আজ বরঞ্চ আমাদের

সভার কার্য বন্ধ থাকে সেও ভালো, তথাপি বর্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারি নে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা-দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম।

চন্দ্র। আমি জানি, কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভালো নেই, এ অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেশ দিতে পারি না। বিশেষত অবলাকান্তবাবু ঘরে বসে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেক দূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। এপর্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে গবর্মেন্ট থেকে যতগুলি রিপোর্ট বাহির হয়েছে সবগুলি ওঁর কাছে দিয়েছিলেম– তার থেকে উনি, জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সংকলন করে রেখেছেন– সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্বসাধারণের সুবোধ্য বাংলা ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করতেও প্রস্তুত হয়েছেন। ইনি যেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্যে যোগদান করেছেন সেজন্যে ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে অদ্যকার সভা আগামী রবিবার পর্যন্ত স্থগিত রাখা গেল। বিপিনবাবু য়ুরোপীয় ছাত্রাগারসকলের নিয়ম ও কার্যপ্রণালী সংকলনের ভার নিয়েছিলেন এবং শ্রীশবাবু স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লণ্ডন নগরে কত বিচিত্র লোকহিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হয়েছে তার তালিকা-সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ-রচনায় প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, বোধ হয় এখনো তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি– সকলেই জানেন, আমাদের দেশের গোরুর গাড়ি এমন ভাবে নির্মিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই গাড়ি উঠে পড়ে এবং গোরুর গলায় ফাঁস লেগে যায়, আবার কোনো কারণে গোরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাইসুদ্ধ গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে। এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি, কৃতকার্য হব বলে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি, অথচ প্রত্যহ সেই গোরুর সহস্র

অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীনভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি– আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতা অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই। আমাদের সভা থেকে যদি এর কোনো প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান-পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি– গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝানো নিতান্ত কঠিন বলে বোধ হয় না। এ সম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েত করবার চেষ্টায় আছি। শ্রীমতী নির্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগিচর্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার-মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করছেন– ভদ্রলোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত করবার জন্যে তিনি দুই-একটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমারসভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফলতা লাভ করতে থাকবে, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ তো আমি আরম্ভও করি নি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চলছে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবছি।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্তবাবুকে ধন্য বলতে হবে, উনি যে কখন আপনার কাজটি করে যাচ্ছেন কিছু বোঝবার জো নেই।

বিপিন। তাই তো, বড়ো আশ্চর্য! অথচ মনে হয়, যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই, ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করে আসিগে।

[শৈলের নিকট গমন

পূর্ণ। রসিকবাবু, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব?

রসিক। কিছু বলবেন না, আমি এমনি বুঝে নেব। কিন্তু সকলে আমার মতো নয় পূর্ণবাবু, আন্দাজে বুঝবে না, বলা-কওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাবু, আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কী করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা-হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ করে দিন-না।

পূর্ণ। ঐ দেখুন-না, অবলাকান্তবাবু আবার ওঁর কাছে গিয়ে বসেছেন–

রসিক। তা হোক-না, তিনি তো ওঁকে চারি দিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে তো ব্যূহের মতো ভেদ করে যেতে হবে না। আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান-না।

পূর্ণ। আচ্ছা, আমি দেখি।

শৈল। (নির্মলার প্রতি) আমাকে এত করে বলবেন না– আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশি কাজ করেছেন। কিন্তু বেচারা পূর্ণবাবুর জন্যে আমার বড়ো দুঃখ হয়। আপনি আসবেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন, অথচ সেটা ব্যক্ত করতে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আপনি যদি ওঁকে–

নির্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক করে দেখছেন বলে আমি বড়ো সংকোচ বোধ করছি; আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন, মহিলা বলে স্বতন্ত্র করবেন না।

শৈল। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে সুবিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে যত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হলে তার চেয়ে বেশি কাজ হবে। যে লোক গুণের দ্বারা নৌকোকে অগ্রসর করে দেবে তাকে নৌকো থেকে কতকটা দূরে থাকতে হবে। চন্দ্রবাবু আমাদের নৌকোর হাল ধরে আছেন, তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন। আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ করতে হবে, সুতরাং আপনাকে পৃথক থাকতে হবে। আমরা সব দাঁড়ীর দলে বসে গেছি।

নির্মলা। আপনাকেও কর্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক বোধ হয়। একদিন মাত্র দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, এ সভার মধ্যে আপনিই আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈল। সে তো আমার সৌভাগ্য। এই-যে, আসুন পূর্ণবাবু! আমরা আপনার কথাই বলছিলেম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা, ঠিক হয়েছে– পুরাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্যেই নূতনের প্রয়োজন।

শৈল। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্যে পুরাতন ধরা-কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা, সে বিচার পরে হবে। কিন্তু আমার সেই রুমালটি? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খুইয়েছি, আবার রুমালটিও খোওয়াতে পারি নে। (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেশমের রুমাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে। এ যে তার

উচিত মূল্য তা বলতে পারি নে– তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন-জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈল। মশায়, এ ছলনাটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়েছেন। এ উপহার আমার জন্যে আসেও নি, যাঁর রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ করে এগুলি–

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু, ভগবান বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়েছেন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হচ্ছে– হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্কটুকু একেবারে দূর হয়।

শৈল। আচ্ছা, আমি দয়ার পরিচয় দিচ্ছি, কিন্তু আপনি সভার জন্যে যে প্রবন্ধ লিখতে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব– রুমালটা ফিরে দিলেই কাজে মন দিতে পারব, তখন অন্য সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাকব।

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। বুঝেছেন রসিকবাবু, আমি তাঁর গানের নির্বাচনচাতুরী দেখে আশ্চর্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু এই গানের নির্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারি একটি সৌকুমার্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন– নির্বাচনের ক্ষমতাই ক্ষমতা। লতায় ফুল তো আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপুণ্য এবং সুরুচি তো তারই।

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে?–

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়\
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়।\
নবীন তরী নতুন চলে,

দিই নি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার-কিনারায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।
ভেসেছিল স্রোতের ভরে,
একা ছিলেন কর্ণ ধ'রে–
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল না গগনকোণে–
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেন সে আশায়।
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়।

রসিক। যাক ডুবে, কী বলেন বিপিনবাবু!

বিপিন। যাকগে। কিন্তু কোথায় ডুবল তার একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিকবাবু, এ গানটা তিনি কেন খাতায় লিখে রাখলেন?

রসিক। স্ত্রীহৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এইরকম একটা প্রবাদ আছে, রসিকবাবু তো তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্রবাবুর কাছে একবার যাও। বাস্তবিক, আমাদের কর্তব্যে আমরা ঢিলে দিয়েছি– ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করলে উনি খুশি হবেন!

বিপিন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই যে সেলাইয়ের কথা বলছিলেন– উনি বুঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহকর্ম করেন?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বুঝি সেদিন গিয়ে দেখলেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো পড়ে রয়েছে, আর তিনি–

রসিক। মাথা নিচু করে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন! তখন স্নান করে এসেছেন বুঝি?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে– তিনি বুঝি তাঁর খাটের উপর বসে–

রসিক। না, খাটে নয়, বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে–

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন–

রসিক। হাঁ, ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর তো পারা যায় না।

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মতো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি– পা দুটি ছড়ানো, মাথা নিচু, খোলা চুল মুখের উপর এসে পড়েছে– বিকেলবেলার আলো–

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান। (শ্রীশের প্রস্থান) রসিকবাবু–

রসিক। (স্বগত) আর কত বকব?

অন্য প্রান্তে

নির্মলা। (পূর্ণের প্রতি) আপনার শরীর আজ বুঝি তেমন ভালো নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে– হাঁ, একটু ইয়ে হয়েছে বটে– বিশেষ কিছু নয়– তবু একটু ইয়ে বৈকি– তেমন বেশ– (কাসি) আপনার শরীর বেশ ভালো আছে?

নির্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি– জিজ্ঞাসা করছিলুম যে আপনি– আপনি– আপনার ইয়ে কী রকম বোধ হয়– ঐ-যে– মিল্‌টনের আরিয়োপ্যাজিটিকা– ওটা কিনা আমাদের এম| এ| কোর্সে আছে, ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না?

নির্মলা। আমি ওটা পড়ি নি।

পূর্ণ। পড়েন নি? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হয়েছে– আপনি– এবারে কিরকম গরম পড়েছে– আমি একবার রসিকবাবু– রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।

[নির্মলার নিকট হইতে প্রস্থান

ঘরের অন্যত্র

বিপিন। রসিকবাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, ও গানটা তিনি বিশেষ কিছু মনে করে লিখেছেন?

রসিক। হতেও পারে। আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে! পূর্বে ওটা ভাবি নি।

বিপিন।

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়

কোন্‌ পাথারে কোন্‌ পাষাণের ঘায়।

আচ্ছা রসিকবাবু, এখানে তরী বলতে ঠিক কী বোঝাচ্ছে?

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্ছে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ঐ পাথারটা কোথায় আর পাষাণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়।

পূর্ণ। (নিকট আসিয়া) বিপিনবাবু, মাপ করবেন– রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে– যদি–

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান

পূর্ণ। আমার মতো নির্বোধ জগতে নেই রসিকবাবু!

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জানে– যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরালা পাই যদি, আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙে গেলে আজ রাত্রে একটু অবসর করতে পারেন?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে, গোলদিঘির ধারে– কী বলেন?

রসিক। (স্বগত) কী সর্বনাশ!

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ, পূর্ণবাবু কথা কচ্ছেন বুঝি। আচ্ছা, এখন থাক্। রাত্রে আপনার অবসর হবে রসিকবাবু?

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মতো– কী বলেন? কাল দেখলেন তো ঘরের চেয়ে পথে জমে ভালো।

রসিক। জমে বৈকি! (স্বগত) সর্দি জমে, কাসি জমে, গলার স্বর দইয়ের মতো জমে যায়।

[শ্রীশের প্রস্থান

পূর্ণ। আচ্ছা রসিকবাবু, আপনি হলে কী বলে কথা আরম্ভ করতেন?

রসিক। হয়তো বলতুম– সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি?

পূর্ণ। তিনি যদি বলতেন, হাঁ–

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়েছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি– শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন–

পূর্ণ। বুঝেছি রসিকবাবু– চমৎকার– এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছে। থাক্ তবে। আমাদের সেই-যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কী বলেন?

রসিক। সেই ভালো।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে– কী বলেন?

রসিক। খুব আরাম। (স্বগত) কিন্তু বেয়ারামটা তার পরে।

অন্যত্র

শৈল। (নির্মলার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ঐ বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারি আমি অল্প অল্প চর্চা করেছি, বেশি নয়, কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সেদিন বেলুন উড়েছিল, আপনি কি ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন?

নির্মলা। বেলুন?

পূর্ণ। হাঁ, ঐ বেলুন। (সকলে নিরুত্তর) রসিকবাবু বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন– আমাকে মাপ করবেন– আপনাদের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলুম– আমি অত্যন্ত হতভাগ্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্বদিনে পূরবালা তাহার মাতার সহিত কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। অক্ষয় কহিলেন, “দেবী, যদি অভয় দাও তো একটি প্রশ্ন আছে।”

পুরবালা। কী শুনি।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গে কৃশতায় তো কোনো লক্ষণ দেখছি নে।

পুরবালা। শ্রীঅঙ্গ তো কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিসটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেছে?

পুরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও তো স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখছি।

অক্ষয়। হতে দিল কই? তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল– বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোনোমতেই বুঝতে দিলে না।–

গান। পিলু

বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ।
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ?
ভেবেছিনু অশ্রুজলে, ডুবিব অকূল তলে,
কাহার সোনার তরী করিল তারণ?

প্রিয়ে, কাশীধামে বুঝি পঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না?

পুরবালা। তা হতে পারে, কিন্তু কলকাতায় তো তাঁর যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে– কোম্পানির শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। দিদি!

অক্ষয়। এখন দিদি বৈ আর কথা নেই– অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদদহনে উত্তেরোত্তর তপ্তকাঞ্চনের মতো শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের কটিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে?

নীরবালা। শুনছ দিদি! এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি– কেবল চিঠি লিখেছেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়েছেন। তুমি এসেছ এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন–

নৃপবালা। দিদি, তুমিও তো, ভাই, এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখ নি?

পুরবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই? মাকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বলতে "তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম' তা হলে কি লোকে নিন্দে করত?

নীরবালা। তা হলে ভগ্নীপতির আস্পর্ধা আরো বেড়ে যেত। মুখুজ্যেমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও-না। দিদি এতদিন পরে এসেছেন, আমরা কি ওঁকে নিয়ে একটু গল্প করতে পাব না?

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদগ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মুষলধারা বর্ষণ-দ্বারা প্রিয়ার চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জে আনন্দরূপ কিসলয়োদ্‌গম করে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ–

নীরবালা। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব–

শৈলের প্রবেশ

অক্ষয়। এসো এসো– উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার–

নীরবালা। উত্তমমধ্যম হয় না।

শৈল। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই, একটু যা তো, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কী বুঝতে পারছিস তো নীরু? হরিনামকথা নয়।

নীরবালা। আচ্ছা, তোমার আর বকতে হবে না।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শৈল। দিদি, নৃপ-নীরর জন্যে মা দুটি পাত্র তা হলে স্থির করেছেন?

পুরবালা। হাঁ, কথা একরকম ঠিক হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলে দুটি মন্দ নয়– তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈল। যদি পছন্দ না করে?

পুরবালা। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী দুটির অদৃষ্ট ভালো।

শৈল। নৃপ-নীরু যদি পছন্দ না করে?

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব।

পুরবালা। পছন্দ আবার না করবে কী? তোদের সব বাড়াবাড়ি। স্বয়ম্বরার দিন গেছে, মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না– স্বামী হলেই তাকে ভালোবাসতে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্তমান ভগ্নীপতির কী দুর্দশাই হত শৈল।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়, ছেলে দুটিকে তা হলে তো খবর দিতে হয়। তারা তো আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ তো মা, রসিকদাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।

জগত্তারিণী। পোড়া কপাল! তোমার রসিকদাদার যেরকম বুদ্ধি! তিনি কাকে আনতে কাকে আনবেন ঠিক নেই।

পুরবালা। তা মা, তুমি কিছু ভেবো না। ছেলে দুটিকে আনবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগত্তারিণী। মা পুরি, তুই একটু মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কিরকম ব্যাভার করতে হয় না-হয় আমি কিছুই বুঝি নে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরির হাতযশ আছে। পুরি তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে! আজকালকার ছেলে কী করে বশ করতে হয় সে বিদ্যে–

পুরবালা। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজকালকার ছেলে?

জগত্তারিণী। মা, তোমরা পরামর্শ করো, কায়েত-দিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় করে আসি!

শৈল। মা, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখো– ছেলে দুটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখ নি, হঠাৎ–

জগত্তারিণী। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল– আর বিবেচনা করতে পারি নে–

অক্ষয়। বিবেচনা সময়মত এর পর করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক।

জগত্তারিণী। বলো তো বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলো তো।

[প্রস্থান

পুরবালা। মিথ্যে তুই ভাবছিস শৈল, মা যখন মনস্থির করেছেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নির্বন্ধ আমি মানি ভাই– যার সঙ্গে যার হবার হাজার বিবেচনা করে ম'লে সে হবেই।

অক্ষয়। সে তো ঠিক কথা। নইলে যার সঙ্গে যার হয়ে থাকে তার সঙ্গে না হয়ে আর-একজনের সঙ্গে হত।

পুরবালা। কী যে তর্ক কর, তোমার অর্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তার কারণ আমি নির্বোধ।

পুরবালা। যাও, এখন স্নান করতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এসোগে।

[প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

শৈল। রসিকদাদা, শুনেছ তো সব? মুশকিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুশকিল কিসের? কুমারসভারও কৌমার্য রয়ে গেল, নৃপ-নীরুও পার পেলে, সব দিক রক্ষা হল।

শৈল। কোনো দিক রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্তত এই বুড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে– দুটো অর্বাচীনের সঙ্গে মিশে আমাকে রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

শৈল। মুখুজ্যেমশায়, তুমি না হলে রসিকদাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না– উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মানতেন সে বয়স পেরিয়েছে কিনা, তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করছে। আচ্ছা, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। চলো তো রসিকদা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ওস্তাদ আসীন। তানপুরা-হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেসুরা গলায় সা রে গা মা সাধিতেছেন। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল, "একটি বাবু এসেছেন।"

বিপিন। বাবু? কিরকম বাবু রে?

ভৃত্য। বুড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে?

ভৃত্য। আছে।

বিপিন। (তানপুরা রাখিয়া) নিয়ে আয়, এখনই নিয়ে আয়! ওরে, তামাক দিয়ে যা। বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টানতে বলে দে। আর দেখ্, চট্ করে গোটাকতক মিঠে-পানের দোনা কিনে আন্ তো রে। দেরি করিস নে, আর আধ সের বরফ নিয়ে আসিস, বুঝেছিস? (পদশব্দ শুনিয়া) রসিকবাবু, আসুন!

বনমালীর প্রবেশ

বিপিন। রসিকবাবু– এ যে সেই বনমালী!

বৃদ্ধ। আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম বনমালী ভট্টাচার্য।

বিপিন। সে পরিচয় অনাবশ্যক। আমি একটু বিশেষ কাজে আছি।

বনমালী। মেয়ে দুটিকে আর রাখা যায় না– পাত্রও অনেক আসছে–

বিপিন। শুনে খুশি হলেম– দিয়ে ফেলুন, দিয়ে ফেলুন–

বনমালী। কিন্তু আপনাদেরই ঠিক উপযুক্ত হত–

বিপিন। দেখুন বনমালীবাবু,এখনো আপনি আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নি– যদি একবার পান তা হলে আমার উপযুক্ততা সম্বন্ধে আপনার ভয়ানক সন্দেহ হবে।

বনমালী। তা হলে আমি উঠি, আপনি ব্যস্ত আছেন, আর-এক সময় আসব।

[প্রস্থান

বিপিন। (তানপুরা তুলিয়া লইয়া) সারেগা রেগামা গামাপা–

শ্রীশের প্রবেশ

শ্রীশ। কী হে বিপিন– এ কী? কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ?

বিপিন। (শিক্ষকের প্রতি) ওস্তাদজি, আজ ছুটি। কাল বিকেলে এসো।

[ওস্তাদের প্রস্থান

কী করব বলো, গান না শিখলে তো আর তোমার সন্ন্যাসীদলে আমল পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা, তুমি যে সারেগামা সাধতে বসেছ, কুমারসভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?

বিপিন। না ভাই, সেটাতে এখনো হাত দিতে পারি নি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাকি?

শ্রীশ। না, আমি হাত দিই নি। (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই, ভারি অন্যায় হচ্ছে। ক্রমেই আমরা আমাদের সংকল্প থেকে যেন দূরে চলে যাচ্ছি।

বিপিন। অনেক সংকল্প ব্যাঙাচির লেজের মতো, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্ধান করে। কিন্তু যদি লেজটুকুই থেকে যেত, আর ব্যাঙটা যেত শুকিয়ে, সে কি-রকম হত? এক সময়ে একটা সংকল্প করেছিলেন বলেই যে সেই সংকল্পের খাতিরে নিজেকে শুকিয়ে মারতে হবে, আমি তো তার মানে বুঝি নে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সংকল্প আছে যার কাছে নিজেকে শুকিয়ে মারাও শ্রেয়। অফলা গাছের মতো আমাদের ডালে-পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত পরিমাণ রসসঞ্চার হচ্ছে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হয়ে যাচ্ছে। আমি ভুল করেছিলুম ভাই বিপিন! সব বড়ো কাজেই তপস্যা চাই; নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আনতে পারলে, চিত্তকে কোনো মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না। এবার থেকে রসচর্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব, এইরকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু সব তৃণেই তো ধান ফলে না; শুকোতে গেলে কেবল নাহক শুকিয়ে মরাই হবে, ফল ফলবে না। কিছুদিন থেকে আমার মনে হচ্ছে আমরা যে সংকল্প গ্রহণ করেছি সে সংকল্প আমাদের দ্বারা সফল হবে না, অতএব আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোনোরকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোনো কাজের কথা নয়। বিপিন, তোমার তম্বুরা ফেলো–

বিপিন। আচ্ছা, ফেললুম, তাতে পৃথিবীর কোনা ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক–

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দুজনে মিলে রসিকবাবুকে একটু সংযত করে রাখব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেন।

দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। একটি বুড়ো বাবু এসেছেন।

বিপিন। বুড়ো বাবু? জ্বালালে দেখছি। বনমালী আবার এসেছে।

শ্রীশ। বনমালী? সে যে এই খানিকক্ষণ হল আমার কাছেও এসেছিল।

বিপিন। ওরে, বুড়োকে বিদায় করে দে।

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে আনুক, আমরা দুজনে মিলে বিদায় করে দিই। (ভৃত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়।

রসিকের প্রবেশ

বিপিন। এ কী! এ তো বনমালী নয়, এ যে রসিকবাবু!

রসিক। আজ্ঞে হাঁ– আপনাদের আশ্চর্য চেনবার শক্তি– আমি বনমালী নই। ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী–

শ্রীশ। না, রসিকবাবু, ও-সব নয়, রসালাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।

রসিক। আঃ, বাঁচিয়েছেন!

শ্রীশ। অন্য সকল-প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্তমনে কুমারসভার কাজে লাগব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী বলে একজন বুড়ো কুমোরটুলির নীলমাধব চৌধুরির দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আমরা সংক্ষেপে তাকে বিদায় করে দিয়েছি– এ-সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসংগত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত।

বিপিন। রসিকবাবু, কিছু জলযোগ করে যেতে হবে।

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দুটো-একটা বিশেষ কথা ছিল, কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সাহস হচ্ছে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না না, তাই বলে কথা থাকলে বলবেন না কেন?

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্ছেন ততটা ভয়ংকর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সঙ্গে?

বিপিন। না, সেদিন যে রসিকবাবু বলছিলেন আমারই সঙ্গে ওঁর দুটো-একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই, থাক্।

শ্রীশ। বলেন তো আজ রাত্রে গোলদিঘির ধারে–

রসিক। না শ্রীশবাবু, মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও ঘরে যাও-না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিকবাবু–

রসিক। না না, দরকার কী–

বিপিন। তার চেয়ে রসিকবাবু, তেতালার ঘরে চলুন– শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা করবেন এখন।

রসিক। না, আপনারা দুজনেই বসুন– আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়! কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না, আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে। সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা-নীরবালার কথা তো পূর্বেই আপনারা শুনেছেন–

শ্রীশ। শুনেছি বৈকি– তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু–

বিপিন। নীরবালার কোনো বিশেষ সংবাদ–

রসিক। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় তো?

রসিক। তার চেয়ে বেশি। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ–

শ্রীশ। বলেন কী রসিকবাবু? বিবাহের তো কোনা কথা শোনা যায় নি–

রসিক। কিচ্ছু না– হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দুটো অকালকুষ্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে দুটির বিবাহ স্থির করেছেন–

বিপিন। এ তো কিছুতেই হতে পারে না রসিকবাবু!

রসিক। মশায়, পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশি। ফুলগাছের চেয়ে আগাছাই বেশি সম্ভবপর।

বিপিন। কিন্তু মশায়, আগাছা উৎপাটন করতে হবে–

শ্রীশ। ফুলগাছ রোপণ করতে হবে–

রসিক। তা তো বটেই, কিন্তু করে কে মশায়?

শ্রীশ। আমরা করব। কী বল বিপিন?

বিপিন। নিশ্চয়ই।

রসিক। কিন্তু, কী করবেন?

বিপিন। যদি বলেন তো সেই ছেলে দুটোকে পথের মধ্যে–

রসিক। বুঝেছি, সেটা মনে করলেও শরীর পুলকিত হয়। কিন্তু বিধাতার বরে অপাত্র জিনিসটা অমর– দুটো গেলে আবার দশটা আসবে।

বিপিন। এদের দুটোকে যদি ছলে বলে কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারি তা হলে ভাববার সময় পাওয়া যাবে।

রসিক। ভাববার সময় সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই শুক্রবারে তারা মেয়ে দেখতে আসবে।

বিপিন। এই শুক্রবারে!

শ্রীশ। সে তো পরশু!

রসিক। আজ্ঞে, পরশুই তো বটে– শুক্রবারকে তো পথের মধ্যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না।

শ্রীশ। আচ্ছা, আমার একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে।

রসিক। কিরকম, শুনি!

শ্রীশ। সেই ছেলে দুটোকে কেউ চেনে?

রসিক। কেউ না।

শ্রীশ। তারা বাড়ি চেনে?

রসিক। তাও না।

শ্রীশ। তা হলে বিপিন যদি সেদিন তাদের কোনোরকম করে আটকে রাখতে পারেন আমি তাদের নাম নিয়ে নৃপবালাকে–

বিপিন। জানই তো ভাই, আমার কোনোরকম কৌশল মাথায় আসে না, তুমি ইচ্ছে করলে কৌশলে ছেলে দুটোকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে– আমি বরঞ্চ নিজেকে তাদের নামে চালিয়ে দিয়ে নীরবালাকে–

রসিক। কিন্তু মশায়, এ স্থলে তো গৌরবে বহুবচন খাটবে না; দুটি ছেলে আসবার কথা আছে, আপনাদের একজনকে দুজন বলে চালানো আমার পক্ষে কঠিন হবে–

শ্রীশ। ও, তা বটে।

বিপিন। হাঁ, সে কথা ভুলেছিলেম।

শ্রীশ। তা হলে তো আমাদের দুজনকেই যেতে হয়। কিন্তু–

রসিক। সে দুটোকে ভুল রাস্তায় চালান করে দিতে আমিই পারব। কিন্তু আপনারা–

বিপিন। আমাদের জন্যে ভাববেন না রসিকবাবু!

শ্রীশ। আমরা সব-তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। আপনারা মহৎ লোক– এরকম ত্যাগস্বীকার–

শ্রীশ। বিলক্ষণ! এর মধ্যে ত্যাগস্বীকার কিছুই নেই।

বিপিন। এ তো আনন্দের কথা।

রসিক। না না, তুব তো মনে আশঙ্কা হতে পারে যে, কী জানি নিজের ফাঁদে যদি নিজেই পড়তে হয়।

শ্রীশ। কিছু না মশায়, কোনো আশঙ্কায় ডরাই নে।

বিপিন। আমাদের যাই ঘটুক তাতেই আমরা সুখী হব।

রসিক। এ তো আপনাদের মহত্ত্বের কথা, কিন্তু আমার কর্তব্য আপনাদের রক্ষা করা। তা আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, এই শুক্রবারের দিনটা আপনারা কোনোমতে উদ্ধার করে দিন– তার পরে আপনাদের আর কোনো দিন বিরক্ত করব না– আপনারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবেন– আমরাও সন্ধান করে ইতিমধ্যে আর দুটি সৎপাত্র জোগাড় করব।

শ্রীশ। আমাদের বিরক্ত করবেন না এ কথা শুনে দুঃখিত হলেম রসিকবাবু!

রসিক। আচ্ছা, করব।

বিপিন। আমরা কি নিজের স্বাধীনতার জন্যেই কেবল ব্যস্ত? আমাদের এতই স্বার্থপর মনে করেন?

রসিক। মাপ করবেন– আমার ভুল ধারণা ছিল।

শ্রীশ। আপনি যাই বলুন, ফস্ করে ভালো পাত্র পাওয়া বড়ো শক্ত!

রসিক। সেইজন্যেই তো এতদিন অপেক্ষা করে শেষে এই বিপদ। বিবাহের প্রসঙ্গমাত্রই আপনাদের কাছে অপ্রিয়, তবু দেখুন আপনাদের সুদ্ধ–

বিপিন। সেজন্যে কিছু সংকোচ করবেন না–

শ্রীশ। আপনি যে আর-কারো কাছে না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, সেজন্যে অন্তরের সঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না। সেই কন্যা দুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে পাখাটা টান।

শ্রীশ। রসিকবাবুর জন্যে জলখাবার আনাবে বলেছিলে–

বিপিন। সে এল বলে! ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ-দেওয়া জল খান–

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও-না। (পকেট হইতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন রসিকবাবু, পান খান।

বিপিন। ও দিকে হাওয়া পাচ্ছেন? এই তাকিয়াটা নিন-না।

শ্রীশ। আচ্ছা, রসিকবাবু, নৃপবালা বুঝি খুব বিষণ্ন হয়ে পড়েছেন–

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব–

রসিক। সে আর বলতে।

শ্রীশ। নৃপবালা বুঝি কান্নাকাটি করছেন?

বিপিন। আচ্ছা, নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভালো করে বুঝিয়ে বলেন না–

রসিক। (স্বগত) ঐ রে, শুরু হল। আমার লেমনেডে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায় কিন্তু এখনই উঠতে হচ্ছে।

শ্রীশ। বলেন কী?

বিপিন। সে কি হয়?

রসিক। সেই ছেলে দুটোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আসতে হবে, নইলে–

শ্রীশ। বুঝেছি, তা হলে এখনই যান!

বিপিন। তা হলে আর দেরি করবেন না!

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

নির্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রের প্রবেশ

চন্দ্র। (স্বগত) বেচারা নির্মল বড়ো কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখছি কদিন ধরে ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে। স্ত্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে? (প্রকাশ্যে) নির্মল!

নির্মলা। (চমকিয়া) কী মামা!

চন্দ্র। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবছ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে দুই-একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলুম না মামা! আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই কদিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিনে হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারছি নে– ভারি অন্যায় হচ্ছে, আজ আমি যেমন করে হোক–

চন্দ্র। না না, জোর করে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্মল, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে দুই-একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে–

নির্মলা। অবলাকান্তবাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেছেন; আমি তাঁকে রোগীশুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরাজি বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেছেন, বোধ হয় এখনই পাওয়া যাবে– তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্র। ঐ ছেলেটি বড়ো ভালো–

নির্মলা। খুব ভালো– চমৎকার–

চন্দ্র। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্যতৎপরতা–

নির্মলা। আর এমন সুন্দর নম্র স্বভাব–

চন্দ্র। ভালো প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়েছি।

নির্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখবামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্র। এত অল্পকালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করি নি– আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকলপ্রকার লেখাপড়ায় এবং কাজে সহায়তা করি!

নির্মলা। তা হলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি! আচ্ছা, এরকম প্রস্তাব করে একবার দেখোই-না! ঐ-যে বেহারা আসছে! বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।– রামদীন, চিঠি আছে? এই দিকে নিয়ে আয়।

বেহারার প্রবেশ ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি-প্রদান

মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও।

চন্দ্র। না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নির্মলা। তোমার চিঠি! অবলাকান্তবাবু বুঝি তোমাকেই লিখেছেন? কী লিখেছেন?

চন্দ্র। না, এটা পূর্ণর লেখা।

নির্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ–

চন্দ্র। পূর্ণ লিখছেন–"গুরুদেব আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য, আপনার মতো বলিষ্ঠপ্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।'

নির্মলা। হয়েছে কী? বোধ হয় পূর্ণবাবু চিরকুমার-সভা ছেড়ে দেবেন তাই এত ভূমিকা করছেন। লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয়, পূর্ণবাবু আজকাল কুমারসভার কোনো কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্র। "দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তা অত্যুচ্চ, যে উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন তাহা গুরুভার– সে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই, কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা শ্রীচরণ-সমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।'

নির্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড়ো কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে, শ্রান্ত মন এক-একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়– কিন্তু সে কি বরাবর থাকে?

চন্দ্র। "সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্যে হাত দিতে যাই তখন সহসা নিজেকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়হীন লতার মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।' নির্মল, আমরা তো ঠিক এই কথাই বলছিলেম।

নির্মলা। পূর্ণবাবু যা লিখেছেন সেটা সত্য, মানুষের সঙ্গ না হলে কেবলমাত্র সংকল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্র। "আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া এ কথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে– তাহাতে বল দান করে না, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত– তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।' তোমার কী মনে হয় নির্মল? (নির্মলা নিরুত্তর) অক্ষয়বাবুও এই কথা নিয়ে সেদিন আমার সঙ্গে তর্ক করছিলেন, তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি নি।

নির্মলা। তা হতে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্র। "গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্তব্য।'

নির্মলা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাবু বেশ বলেছেন।

চন্দ্র। আমিও কিছুদিন থেকে মনে করছিলেম কুমারব্রত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব।

নির্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না, কী বল মামা? অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন? অবলাকান্তবাবু, শ্রীশবাবু–

চন্দ্র। আপত্তির কোনো কারণ নেই।

নির্মলা। তবু একবার অবলাকান্তবাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্র। মত তো নিতেই হবে। (পত্রপাঠ) "এপর্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।'

নির্মলা। মামা, পূর্ণবাবু হয়তো কোনো গোপনীয় কথা লিখছেন, তুমি চেঁচিয়ে পড়ছ কেন?

চন্দ্র। ঠিক বলেছ ফেনি! (আপন-মনে পাঠ) কী আশ্চর্য! আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ! এতদিন তো আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। নির্মল, পূর্ণবাবুর কোনো ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে–

নির্মলা। হাঁ, পূর্ণবাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্বোধের মতো ঠেকেছিল।

চন্দ্র। অথচ পূর্ণবাবু খুব বুদ্ধিমান। তা হলে তোমাকে খুলে বলি– পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন–

নির্মলা। তুমি তো তাঁর অভিভাবক নও– তোমার কাছে প্রস্তাব–

চন্দ্র। আমি যে তোমার অভিভাবক — এই পড়ে দেখো।

নির্মলা। (পত্র পড়িয়া রক্তিমমুখে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্র। আমি তাকে কী বলব?

নির্মলা। বোলো কোনোমতে হতেই পারে না।

চন্দ্র। কেন নির্মল, তুমি তো বলছিলে কুমারব্রত পালনের নিয়ম সভা হতে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব করবে তাকেই–

চন্দ্র। পূর্ণবাবু তো যে-সে নয়, অমন ভালো ছেলে–

নির্মলা। মামা, তুমি এ-সব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না– আমার কাজ আছে।

[প্রস্থানোদ্যম

মামা, তোমার পকেটে ওটা কী উঁচু হয়ে আছে?

চন্দ্র। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ, ভুলে গিয়েছিলেম– বেহারা আজ সকালে তোমার নামে লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে–

নির্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখো দেখি মামা, কী অন্যায়, অবলাকান্তবাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে, আমাকে দাও নি? আমি ভাবছিলেম তিনি হয়তো ভুলেই গেছেন– ভারি অন্যায়!

চন্দ্র। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশি অন্যায় ভুল আমি প্রতিদিনই করে থাকি ফেনি, তুমিই তো আমাকে প্রত্যেকবার সহাস্যে মাপ করে করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্মলা। না, ঠিক অন্যায় নয়– আমিই অবলাকান্তবাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায় করছিলেম, ভাবছিলেম– এই-যে রসিকবাবু আসছেন। আসুন রসিকবাবু, মামা এইখানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ

চন্দ্র। এই-যে রসিকবাবু এসেছেন ভালোই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভালো হয় চন্দ্রবাবু, তা হলে আপনাদের পক্ষে ভালো অত্যন্ত সুলভ। যখনই বলবেন তখনই আসব, না বললেও আসতে রাজি আছি।

চন্দ্র। আমরা মনে করছি আমাদের সভা থেকে চিরকুমার ব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব– আপনি কী পরামর্শ দেন?

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরামর্শ দিতে পারব, কারণ, এ ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দুই-ই সমান। আমার পরামর্শ এই যে, উঠিয়ে দিন– নইলে সে কোন্ দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সকলকে ডেকে বলেছিল, বাবা-সকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব। স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভালো হয়েছিল।

চন্দ্র। ঠিক বলেছেন রসিকবাবু, যে জিনিস বলপূর্বক আসবেই তাকে বল প্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভালো। আসছে রবিবারের পূর্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

রসিক। আচ্ছা, শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন, আমি সকলকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্র। রসিকবাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হলে আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি-সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে–

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্ছে, কিন্তু সময় খুব যে বেশি–

নির্মলা। না রসিকবাবু, আপনি ও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ করো, আমরা থাকলে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তা হলে চলুন।

নির্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্তবাবু আমাকে তাঁর সেই লেখাটি পাঠিয়ে দিয়েছেন– আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সেজন্যে আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন।

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়! দেখো তো, মেয়েদের নিয়ে আমি কী করি! নেপ বসে বসে কাঁদছে, নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোনোমতেই বেরোবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনই আসবে, তাদের এখন কী বলে ফেরাব। তুমিই বাপু, ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ, এখন তুমিই ওদের সামলাও।

পুরবালা। সত্যি, আমি ওদের রকম দেখে অবাক হয়ে গেছি, ওরা কি মনে করেছে ওরা–

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর কাউকে ওরা পছন্দ করছে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারই মতো।

পুরবালা। ঠাট্টা রাখো, এখন ঠাট্টার সময় নয়– তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কি না বলো। তুমি না বললে ওরা শুনবে না।

অক্ষয়। এত অনুগত! একেই বলে ভগ্নীপতিব্রতা শ্যালী। আচ্ছা, আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও– দেখি!

[জগত্তারিণী ও পুরবালার প্রস্থান

নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

নীরবালা। না, মুখুজ্যেমশায়, সে কোনোমতেই হবে না।

নৃপবালা। মুখুজ্যেমশায়, তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাদের যার তার সামনে ওরকম করে বের কোরো না।

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হলে একজন বলেছিল, আমাকে বেশি উঁচুতে চড়িয়ো না, আমার মাথাঘোরা ব্যামো আছে– তোদের যে তাই হল। বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এখন দেখা দিতে লজ্জা করলে চলবে কেন?

নীরবালা। কে বললে আমরা বিয়ে করতে যাচ্ছি?

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার হচ্ছে! কিন্তু হৃদয় দুর্বল এবং দৈব বলবান, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়–

নীরবালা। না, ভঙ্গ হবে না।

অক্ষয়। হবে না তো? তবে নির্ভয়ে এসো; যুবক দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও– হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে মরে থাকুক।

নীরবালা। অকারণে প্রাণিহত্যা করবার জন্যে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কী দয়া! কিন্তু সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দরকার কী? তোদের মা-দিদি যখন ধরে পড়েছেন এবং ভদ্রলোক দুটি যখন গাড়ি-ভাড়া করে আসছে তখন একবার মিনিট পাঁচেকের মতো দেখা দিস, তার পরে আমি আছি– তোদের অনিচ্ছায় কোনোমতেই বিবাহ দিতে দেব না।

নীরবালা। কোনোমতেই না?

অক্ষয়। কোনোমতেই না।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। আয় তোদের সাজিয়ে দিইগে।

নীরবালা। আমরা সাজব না!

পুরবালা। ভদ্রলোকদের সামনে এইরকম বেশেই বেরোবি? লজ্জা করবে না?

নীরবালা। লজ্জা করবে বৈকি দিদি, কিন্তু সেজে বেরোতে আরো বেশি লজ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনীবেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন, শকুন্তলা যখন দুষ্যন্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল– কালিদাস বলেন সেও কিছু আঁট হয়ে পড়েছিল, তোমার বোনেরা সেই-সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে, সাজতে চায় না!

পুরবালা। সে-সব হল সত্যযুগের কথা। কলিকালের দুষ্যন্ত মহারাজরা সাজ-সজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা–

পুরবালা। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে মা বুঝি আমাকে সাজিয়ে দেন নি?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্যে না জানি কত শোভা হবে!

পুরবালা। আচ্ছা, তুমি থামো, নীরু আয়!

নীরবালা। না ভাই দিদি–

পুরবালা। আচ্ছা, সাজ নাই করলি চুল তো বাঁধতে হবে!

অক্ষয়।

গান

অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু শিথিলকবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজলনয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো।
আকুল আঁচলে পথিকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো।

না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ

নিদয়া নীরবে সাধিয়ো।

পুরবালা। তুমি আবার গান ধরলে? আমি কখন কী করি বলো দেখি। তাদের আসবার সময় হল– এখনো আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে।

[নৃপ ও নীরকে লইয়া প্রস্থান

রসিকের প্রবেশ

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধের সমস্তই প্রস্তুত?

রসিক। সমস্তই– বীরপুরুষ দুটিও সমাগত।

অক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র দুটি সাজতে গেছেন। তুমি তা হলে সেনাপতির ভার গ্রহণ করো, আমি একটু অন্তরালে থাকতে ইচ্ছা করি।

রসিক। আমিও প্রথমটা একটু আড়াল হই।

[উভয়ের প্রস্থান

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ

শ্রীশ। বিপিন, তুমি তো আজকাল সংগীতবিদ্যার উপর চীৎকারশব্দে ডাকাতি আরম্ভ করেছ– কিছু আদায় করতে পারলে?

বিপিন। কিছু না। সংগীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তসুর অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোকবার জো আছে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হল?

শ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে। সেদিন বইয়ে পড়ছিলুম–

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে

বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে!

চলে গেল বেলা, রেখে মিছে খেলা

ঝাঁপ দিয়ে পড়ো কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা পাস তা নিয়ে
হেসে কেঁদে চলো ঘরে ফিরে।

মনে হচ্ছিল এর সুরটা যেন জানি, কিন্তু গাবার জো নেই!

বিপিন। জিনিসটা মন্দ নয় হে– তোমার কবি লেখে ভালো। ওহে, ওর পরে আর কিছু নেই? যদি শুরু করলে তবে শেষ করো!

শ্রীশ।

নাহি জানি মনে কী বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া।
কী কুসুমবাসে ফাগুনবাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া।
চল্ ওরে এই খেপা বাতাসেই
সাথে নিয়ে সেই উদাসীরে।

বিপিন। বাঃ বেশ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্‌ফের কাছে তুমি কী খুঁজে বেড়াচ্ছ?

শ্রীশ। সেই-যে সেদিন যে বইটাতে দুটি নাম লেখা দেখেছিলাম, সেইটে–

বিপিন। না ভাই, আজ ও-সব নয়!

শ্রীশ। কী-সব নয়?

বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোনোরকম–

শ্রীশ। কী আশ্চর্য বিপিন! তাঁদের কথা নিয়ে আমি কি এমন কোনো আলোচনা করতে পারি যাতে–

বিপিন। রাগ কোরো না ভাই– আমি নিজের সম্বন্ধেই বলছি, এই ঘরেই আমি অনেক সময় রসিকবাবুর সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে যে ভাবে আলাপ করেছি আজ সে ভাবে কোনো কথা উচ্চারণ করতেও সংকোচ বোধ হচ্ছে– বুঝছ না–

শ্রীশ। কেন বুঝব না? আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখবার ইচ্ছে করেছিলুম মাত্র– একটি কথাও উচ্চারণ করতুম না!

বিপিন। না, আজ তাও না। আজ তাঁরা আমাদের সম্মুখে বেরোবেন, আজ আমরা যেন তার যোগ্য থাকতে পারি।

শ্রীশ। বিপিন, তোমার সঙ্গে–

বিপিন। না ভাই, আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, আমি হারলুম– কিন্তু বইটা রাখো।

রসিকের প্রবেশ

রসিক। এই-যে আপনারা এসে একলা বসে আছেন, কিছু মনে করবেন না–

শ্রীশ। কিছু না। এই ঘরটি আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে নিয়েছিল।

রসিক। আপনাদের কত কষ্টই দেওয়া গেল!

শ্রীশ। কষ্ট আর দিতে পারলেন কই? একটা কষ্টের মতো কষ্ট স্বীকার করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতুম।

রসিক। যা হোক, অল্পক্ষণের মধ্যেই চুকে যাবে এই এক সুবিধে, তার পরেই আপনারা স্বাধীন। ভেবে দেখুন দেখি যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত তা হলেই পরিণামে বন্ধনভয়ং! বিবাহ জিনিসটা মিষ্টান্ন দিয়েই শুরু হয়, কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না। আচ্ছা, আজ আপনারা দুঃখিতভাবে এরকম চুপচাপ করে বসে আছেন কেন বলুন দেখি। আমি বলছি আপনাদের কোনো ভয় নেই। আপনারা বনের বিহঙ্গ, দুটিখানি

সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন, কেউ আপনাদের বাঁধবে না। নাত্র ব্যাধশরাঃ পতন্তি পরিতো নৈবাত্র দাবানলঃ। দাবানলের পরিবর্তে ডাবের জল পাবেন।

শ্রীশ। আমাদের সে দুঃখ নয় রসিকবাবু, আমরা ভাবছি আমাদের দ্বারা কতটুকু উপকারই বা হচ্ছে। ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা তো দূর করতে পারছি নে।

রসিক। বিলক্ষণ! যা করছেন তাতে আপনারা দুটি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করছেন– অথচ নিজেরা কোনোপ্রকার পাশেই বদ্ধ হচ্ছেন না।

জগত্তারিণী। (নেপথ্যে মৃদুস্বরে) আঃ নেপ, কী ছেলেমানুষি করছিস! শিগ্‌গির চোখের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা! লক্ষ্মী মা আমার– কেঁদে চোখ লাল করলে কিরকম ছিরি হবে ভেবে দেখ্‌ দেখি!– নীর, যা-না! তোদের সঙ্গে আর পারি নে বাপু! ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? কী মনে করবেন?

শ্রীশ। ঐ শুনছেন রসিকবাবু? এ অসহ্য! এর চেয়ে রাজপুতদের কন্যাহত্যা ভালো।

বিপিন। রসিকবাবু, এঁদের এই সংকট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যে আপনি আমাদের যা বলবেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি।

রসিক। কিছু না, আপনাদের আর অধিক কষ্ট দেব না! কেবল আজকের দিনটা উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান– তার পরে আপনাদের আর কিছুই ভাবতে হবে না।

শ্রীশ। ভাবতে হবে না? কী বলেন রসিকবাবু! আমরা কি পাষাণ? আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এঁদের জন্য ভাববার অধিকার পাব।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এঁদের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপুরুষ।

শ্রীশ। এখন থেকে এঁদের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্বের বিষয়– গৌরবের বিষয়।

রসিক। তা বেশ, ভাববেন, কিন্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর কোনো কষ্ট করতে হবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্ছে কেন?

বিপিন। এঁদের জন্যে যদিই আমাদের কোনো কষ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দু দিন ধরে, রসিকবাবু, বেশি কষ্ট পেতে হবে না বলে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন। এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ করবেন– আমি আর কখনো এমন অবিবেচনার কাজ করব না, আপনারা কষ্ট স্বীকার করবেন!

শ্রীশ। আপনি কি এখনো আমাদের চিনলেন না?

রসিক। চিনেছি বৈকি, সেজন্যে আপনারা কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপবালা ও নীরবালার প্রবেশ

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিকবাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না, সেজন্যে যদি ক্ষমা না করেন তবে–

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের আর অপরাধ বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স, মান্য অতিথিদের কিরকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তা হলে আপনাদের প্রতি অসদ্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরো লজ্জিত করবেন না। নৃপদিদি, নীরদিদি– কী বল ভাই! যদিও এখনো তোমাদের চোখের পাতা শুকোয় নি, তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি? (নৃপ ও নীর লজ্জিত-নিরুত্তর) না, একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার।

(জনান্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কী বলি বলো তো ভাই? বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও!

নীরবালা। (মৃদুস্বরে) রসিকদাদা, কী বকো তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি! আমরা কি জানতুম এঁরা এসেছেন?

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন–

সখা, কী মোর করমে লেখি!

তপত বলিয়া তপনে ডরিনু,

চাঁদের কিরণ দেখি!

এর উপরে আপনাদের কিছু বলবার আছে?

নীরবালা। (জনান্তিকে) আঃ রসিকদাদা, কী বলছ তার ঠিক নেই! ও কথা আমরা কখন বললুম!

রসিক। (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারি নি বলে এঁরা আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। এঁরা বলতে চান, চাঁদের কিরণ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না– তার চেয়ে আরো যদি–

নীরবালা। (জনান্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব।

রসিক। সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ উজ্‌ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্! (শ্রীশ ও বিপিনের প্রতি) এঁরা বলছেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এঁরা লজ্জায় এ ঘর থেকে চলে যাবেন।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থানোদ্যম

শ্রীশ। রসিকবাবুর অপরাধে আপনারা নির্দোষদের সাজা দেবেন কেন? আমরা তো কোনোপ্রকার প্রগল্‌ভতা করি নি।

[নৃপ ও নীরর 'ন যযৌ ন তস্থৌ' ভাব

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্বকৃত কোনো অপরাধ যদি থাকে তো ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না?

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বেচারা অনেক দিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা করছে–

নীরবালা। (জনান্তিকে) অপরাধ কী হয়েছে যে ক্ষমা করতে যাব?

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বলছেন, আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষ্যই করেন নি! কিন্তু আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতেম তবে সেটা অপরাধ হত– আইনের বিশেষ ধারায় এইরকম লিখছে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাবু! আপনারা সর্বদাই অপরাধ করবার সুযোগ পান এবং সেজন্যে দণ্ডভোগ করে কৃতার্থ হন, আমি দৈবক্রমে একটা অপরাধ করবার সুবিধা পেয়েছিলুম, কিন্তু এতই অধম যে দণ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না!

রসিক। বিপিনবাবু, একেবারে হতাশ হবেন না। শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্ করে মুক্তি না পেতেও পারেন।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। জলখাবার তৈরি।

[নৃপ ও নীরর প্রস্থান

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসছি রসিকবাবু? জলখাবারের জন্যে এত তাড়া কেন!

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ।

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সমাপনটা তো মধুর নয়। (জনান্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এঁদের প্রতারণা করে যেতে পারব না!

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড।

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্তব্য কী।

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে?

রসিক। আপনারা দেখছি ভয় পেয়ে গেছেন! কোনো আশঙ্কা নেই, শেষকালে যেমন করেই হোক আপনাদের উদ্ধার করবই।

[সকলের প্রস্থান

অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ

জগত্তারিণী। দেখলে তো বাবা, কেমন ছেলে দুটি?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভালো, এ কথা আমি তো অস্বীকার করতে পারি নে।

জগত্তারিণী। মেয়েদের রকম দেখলে তো বাবা! এখন কান্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই!

অক্ষয়। ঐ তো ওদের দোষ। কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্বাদ দিয়ে ছেলে দুটিকে দেখতে হচ্ছে।

জগত্তারিণী। সে কি ভালো হবে অক্ষয়? ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে?

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্বাদ করে গেলেই চট্‌পট্‌ স্থির হয়ে যায়!

জগত্তারিণী। তা বেশ, তোমরা যদি বল তো যাব। আমি ওদের মার বয়সী, আমার লজ্জা কিসের।

পুরবালার প্রবেশ

পুরবালা। খাবার গুছিয়ে দিয়ে এসেছি। ওদের কোন্ ঘরে বসিয়েছে, আমি আর দেখতেই পেলুম না।

জগত্তারিনী। কী আর বলব পুরো, এমন সোনার চাঁদ ছেলে!

পুরবালা। তা জানতুম। নীর-নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে।

অক্ষয়। তাদের বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর-কি।

পুরবালা। আচ্ছা, থামো। যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করোগে। — কিন্তু শৈল গেল কোথায়?

অক্ষয়। সে খুশি হয়ে দরজা বন্ধ করে পুজোয় বসেছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

অক্ষয়। ব্যাপারটা কী? রসিকদা, আজকাল তো খুব খাওয়াচ্ছ দেখছি। প্রত্যহ যাকে দু বেলা দেখছ তাকে হঠাৎ ভুলে গেলে?

রসিক। এঁদের নূতন আদর, পাতে যা পড়ছে তাতেই খুশি হচ্ছেন। তোমার আদর পুরোনো হয়ে এল, তোমাকে নতুন করে খুশি করি এমন সাধ্য নেই ভাই!

অক্ষয়। কিন্তু শুনেছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এ পরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে– এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাচ্ছেন না কি? ওহে রসিকদা, ভুল কর নি তো?

রসিক। ভুলের জন্যেই তো আমি বিখ্যাত। বড়ো মা জানেন তাঁর বুড়ো রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কী রসিকদাদা? করেছ কী? সে দুটি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি!

অক্ষয়। সে বেচারাদের কী গতি হবে?

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরীর বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করছেন। বনমালী ভট্টাচার্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বুঝলুম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকমের হবে। এইবেলা ভ্রম সংশোধন করে নাও। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু, কিছু মনে কোরো না, এর মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরলপ্রকৃতি রসিকবাবু সে রহস্য আমাদের নিকট ভেদ করেই দিয়েছেন। আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি।

বিপিন। মিষ্টান্নের থালায় আমরা অনধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কী বিপিনবাবু? তা হলে চিরকুমার-সভাকে চিরজন্মের মতো কাঁদিয়ে এসেছ? জেনেশুনে? ইচ্ছাপূর্বক?

রসিক। না না, তুমি ভুল করছ অক্ষয়!

অক্ষয়। আবার ভুল? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল না কি?–

গান

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়!
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে
ফুলে ফুলে হোক ফুলময়!
আনন্দ-ঢেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক কূলময়।

রসিক। একি, বড়ো মা আসছেন যে!

অক্ষয়। আসবারই কথা। উনি তো কুমারটুলির ঠিকানায় যাবেন না।

জগত্তারিণীর প্রবেশ

শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম। দুইজনকে দুই মোহর দিয়া জগত্তারিণীর আশীর্বাদ। জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগত্তারিণীর আলাপ।

অক্ষয়। মা বলছেন, তোমাদের আজ ভালো করে খাওয়া হল না, সমস্তই পাতে পড়ে রইল।

শ্রীশ। আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি।

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে ওটা তৃতীয় কিস্তি।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাকলে আমাদেরই পড়ে থাকতে হত।

জগত্তারিণী। (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথাবার্তা কও বাছা, আমি আসি।

[প্রস্থান

রসিক। না, এ ভারি অন্যায় হল।

অক্ষয়। অন্যায়টা কী হল?

রসিক। আমি ওঁদের বারবার করে বলে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছুটি পাবেন, কোনোরকম বধবন্ধনের আশঙ্কা নেই। কিন্তু–

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় রসিকবাবু, আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন?

রসিক। বলেন কী শ্রীশবাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন–

বিপিন। তা বেশ তো, এমনই কি মহাবিপদে ফেলেছেন!

শ্রীশ। মা আমাদের যে আশীর্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই।

রসিক। না না, শ্রীশবাবু, সে কোনো কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদ্রতার খাতিরে–

বিপিন। রসিকবাবু, আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না– দায়ে পড়ে–

রসিক। দায় নয় তো কী মশায়! সে কিছুতেই হবে না। আমি বরঞ্চ সেই ছেলে দুটোকে বনমালীর হাত ছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনো ফিরিয়ে আনব, তবু–

শ্রীশ। আপনার কাছে কী অপরাধ করেছি রসিকবাবু?

রসিক। না না, এ তো অপরাধের কথা হচ্ছে না। আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেছেন, আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে–

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এটুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না– এমনি হিতৈষী বন্ধু!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সৌভাগ্য বলে স্বীকার করছি আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করছেন কেন?

রসিক। শেষকালে আমাদের দোষ দেবেন না।

বিপিন। নিশ্চয় দেব, যদি না আপনি স্থির হয়ে শুভকর্মে সহায়তা করেন।

রসিক। আমি এখনো সাবধান করছি–

গতং তদ্‌গাম্ভীর্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ।
সখে হংসোত্তিষ্ঠ, ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ॥

সে গাম্ভীর্য গেল কোথা, নদীতটে হেরো হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে–
সখে হংস, ওঠো ওঠো, সময় থাকিতে ছোটো
হেথা হতে মানসের তীরে।

শ্রীশ। কিছুতেই না। তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুঁড়ে মারলেও সখা হংসরা কিছুতেই এখান থেকে নড়ছেন না।

রসিক। স্থান খারাপ বটে। নড়বার জো নেই। আমি তো অচল হয়ে বসে আছি, হায় হায়–

অয়ি কুরঙ্গ তপোবনবিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপুরীমিমাম্‌॥

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। চন্দ্রবাবু এসেছেন।

অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

[ভৃত্যের প্রস্থান

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর দুটিকে সমর্পণ করে দেওয়া হোক।

চন্দ্রবাবুর প্রবেশ

চন্দ্র। এই-যে আপনারা এসেছেন। পূর্ণবাবুকেও দেখছি।

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তবু অক্ষয় বটে।

চন্দ্র। অক্ষয়বাবু! তা, বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল।

অক্ষয়। আমার মতো অদরকারি লোককে যে দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি– বলুন কী করতে হবে।

চন্দ্র। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমারব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করে রাখা হচ্ছে। শ্রীশবাবু বিপিনবাবুকে এই কথাটা একটু ভালো করে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারি কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কি না সন্দেহ।

চন্দ্র। একবার একটা মতকে ভালো বলে গ্রহণ করেছি বলেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়ো। শ্রীশবাবু, বিপিনবাবু–

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য–

চন্দ্র। কেন বাহুল্য? আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত করবেন না?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে–

চন্দ্র। আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনো সেই মতেই–

রসিক। এই-যে পূর্ণবাবু আসছেন। আসুন আসুন।

পূর্ণর প্রবেশ

চন্দ্র। পূর্ণবাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমারব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। কিন্তু শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এখন ওঁদের বোঝাতে পারলেই–

রসিক। ওঁদের বোঝাতে আমি ত্রুটি করি নি চন্দ্রবাবু–

চন্দ্র। আপনার মতো বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে–

রসিক। ফল যা পেয়েছি তা ফলেন পরিচীয়তে।

চন্দ্র। কী বলছেন ভালো বুঝতে পারছি নে।

অক্ষয়। ওহে রসিকদা, চন্দ্রবাবুকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আমি দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনই এনে উপস্থিত করছি।

[প্রস্থান

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ভালো আছেন তো?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনাকে একটু শুক্‌নো দেখাচ্ছে।

পূর্ণ। না, কিছু না।

শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর তো দেরি নেই।

পূর্ণ। না।

নৃপবালা ও নীরবালাকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ

অক্ষয়। (নৃপ ও নীরর প্রতি) ইনি চন্দ্রবাবু, ইনি তোমাদের গুরুজন, এ কে প্রণাম করো। (নৃপ ও নীরর প্রণাম) চন্দ্রবাবু, নূতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই দুটি সভ্য বাড়ল।

চন্দ্র। বড়ো খুশি হলেম। এঁরা কে?

অক্ষয়। আমার সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এঁরা আমার দুটি শ্যালী। শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরো ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রতি দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিকবাবু এই যুবক দুটির যে মতের পরিবর্তন করিয়েছেন সে কেবলমাত্র বাগ্মিতার দ্বারা নয়।

চন্দ্র। বড়ো আনন্দের কথা।

পূর্ণ। শ্রীশবাবু, বড়ো খুশি হলুম! বিপিনবাবু, আপনাদের বড়ো সৌভাগ্য! আশা করি অবলাকান্তবাবুও বঞ্চিত হন নি, তাঁরও একটি–

নির্মলার প্রবেশ

চন্দ্র। নির্মলা, শুনে খুশি হবে, শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। তা হলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য।

নির্মলা। কিন্তু অবলাকান্তবাবুর মত তো নেওয়া হয় নি–তাঁকে এখানে দেখছি নে–

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম, তিনি আজ এখনো এলেন না কেন?

রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্তন দেখলে আপনারা আরো আশ্চর্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যেরকম লোভনীয় হয়ে উঠল, এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

চন্দ্র। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আর-একটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ করবেন না– বাসরঘরে

ভূতপূর্ব কুমারসভাটিকে সাধ্যমত পিণ্ডদান করে তার পরে যদি দেখা দেন। এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়!

শৈলের প্রবেশ

শৈল। (চন্দ্রকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন।

শ্রীশ। এ কী, অবলাকান্তবাবু–

অক্ষয়। আপনারা মত পরিবর্তন করেছেন, ইনি বেশ পরিবর্তন করেছেন মাত্র।

রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাতবেশ ধারণ করেছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনীবেশ গ্রহণ করলেন।

চন্দ্র। নির্মলা, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

নির্মলা। অন্যায়! ভারি অন্যায়! অবলাকান্তবাবু–

অক্ষয়। নির্মলা দেবী ঠিক বলেছেন– অন্যায়! কিন্তু সে বিধাতার অন্যায়। এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কী মঙ্গল সাধন করছেন সে রহস্য আমাদের অগোচর।

শৈল। (নির্মলার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কি হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাবুর পত্রে আমি যে স্পর্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল– আমার মতো অযোগ্য–

চন্দ্র। কিছু অন্যায় হয় নি পূর্ণবাবু, আপনার যোগ্যতা যদি নির্মলা না বুঝতে পারেন তো সে নির্মলারই বিবেচনার অভাব।

[নির্মলার নতমুখে নিরুত্তরে অবস্থান

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণবাবু, আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর, প্রজাপতির আদালতে ডিক্রি পেয়েছেন– কাল প্রত্যুষেই জারি করতে বেরোবেন।

শ্রীশ।(শৈলবালার প্রতি) বড়ো ফাঁকি দিয়েছেন।

বিপিন। সম্বন্ধের পূর্বেই পরিহাসটা করে নিয়েছেন।

শৈল।পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না।

বিপিন। নিষ্কৃতি চাই নে।

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল– এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ করে দেওয়া যাক।–

সর্বস্তরতু দুর্গাণি সর্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।

সর্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু॥